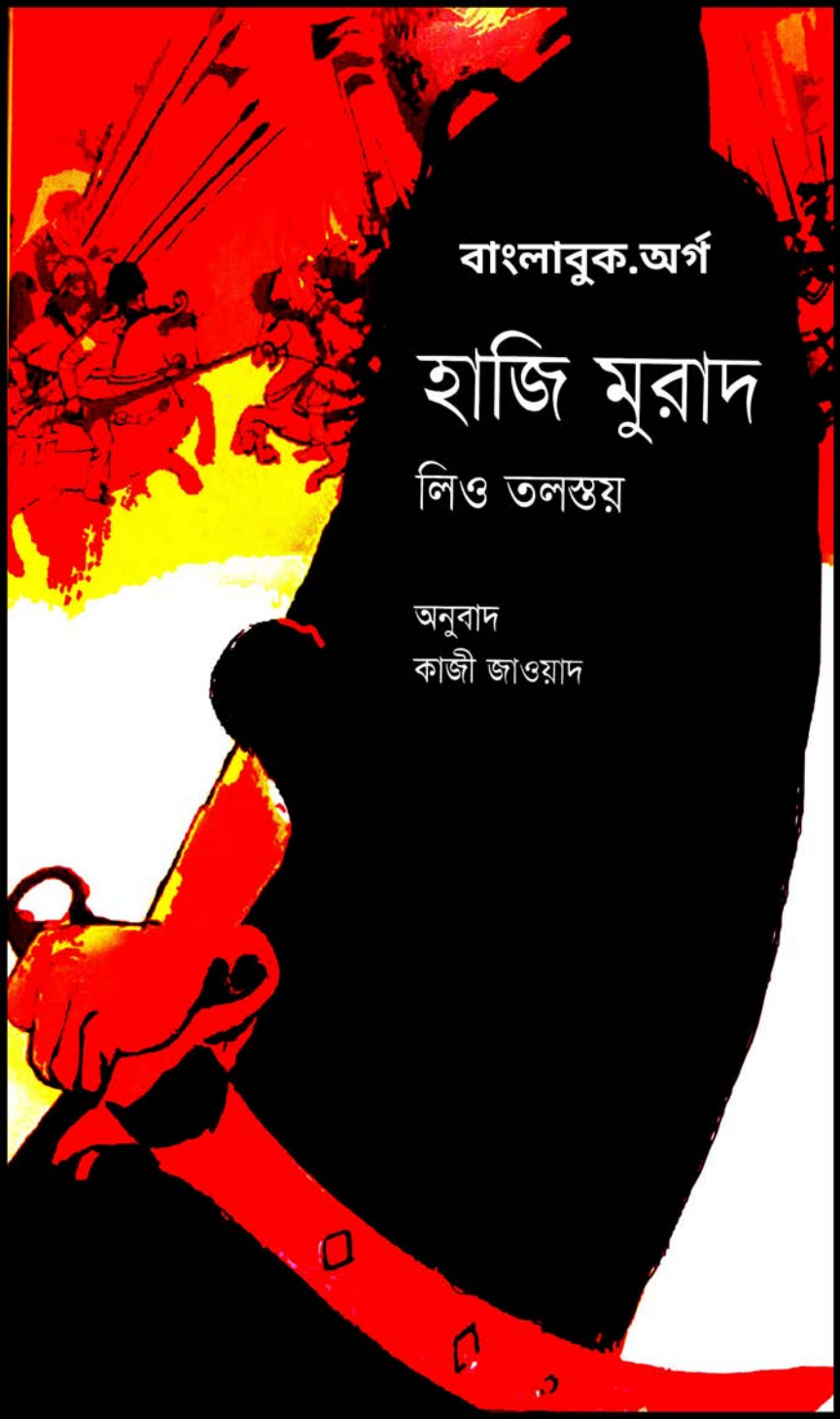

বাংলাবুক.অর্গ
হাজি মুরাদ
লিও তলস্তয়
অনুবাদ
কাজী জাওয়াদ

রুশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আভার জাতির এক মুক্তিযোদ্ধা হাজি মুরাদ। তলস্তয়ের চোখে সৎ স্বাধীনচেতা এই চরিত্রের প্রতীক কাঁটা গেন্ধালিগাছ। জীবনের স্পৃহা যার প্রবল, মৃত্যু যার হাতের খেলনা, তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধল সহযোদ্ধা শামিলের। শামিল হাজি মুরাদের মা, স্ত্রী ও সন্তানদের আটক করে। প্রতিশোধ নিতে হাজি মুরাদ হাত মেলান শত্রু রুশদের সঙ্গে। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। হাজি মুরাদ—বশ না-মানা এক বিদ্রোহী যোদ্ধার কাহিনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

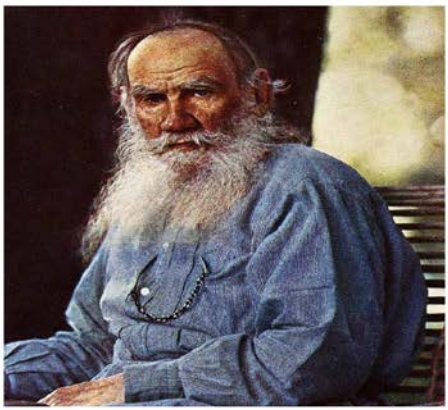

লিও তলস্তয়

জন্ম মস্কো থেকে প্রায় ১৩০ মাইল দক্ষিণে এক অভিজাত পরিবারে। শৈশবে মা-বাবাকে হারান। পুরো নাম লেভ নিকোলায়েভিচ গ্রাফ (কাউন্ট) তলস্তয় বা লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)। তাঁর দুটো বড় উপন্যাস *ওয়ার অ্যান্ড পিস* এবং *আনা কারেনিনা* সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস বলে স্বীকৃত। প্রথাগত শিক্ষায় আগ্রহ না থাকায় তাঁর উচ্চশিক্ষা হয়নি। জুয়া খেলায় প্রচুর টাকা হেরে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে ককেশাসে যান এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *শৈশব* প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। তলস্তয় *হাজি মুরাদ* লিখেছিলেন ১৮৯৬ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে। প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯১২ সালে। সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। উপন্যাসের নায়ক হাজি মুরাদ ককেশীয় দাগেস্তান ও চেচনিয়ায় প্রতিরোধের এক আভার যোদ্ধা। আরেক বিদ্রোহী নেতা ইমাম শামিল হাজি মুরাদের পরিবারের সবাইকে আটক করেন। শামিলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য হাজি মুরাদ রুশ দখলদারদের সঙ্গে হাত মেলান। শৌর্য, সৌন্দর্য, স্নেহ ও দ্বন্দ্বে এক অনুপম উপন্যাস *হাজি মুরাদ*।

হাজি মুরাদ

হাজি মুরাদ

লিও তলস্তোয়

অনুবাদ
কাজী জাওয়াদ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথমা

প্রথমা

হাজি মুরাদ

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২৬, ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮০০৮১

প্রচ্ছদ নির্ঝর নৈঃশব্দ

মুদ্রণ : ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৬০ টাকা

Haji Murad
A Bangla translation of *Haji Murad*
by Lio Tolstoy
Translated from english by Kazi Zawad
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone 8180081
e-mail prothoma@prothomalo.com

Price Taka 260 only

ISBN 978 984 525 088 7

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাবাকে

যিনি বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন

অনুবাদকের কথা

আশির দশকের শেষভাগে রাশিয়ায় গর্বাচভের 'খোলা হাওয়া' বইছে। দমকা বাতাসে ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীন হয়ে গেল। স্বায়ত্তশাসিত চেচেন-ইঙ্গুশ প্রজাতন্ত্র ভেঙে দুটো হলো। খোদ গর্বাচভ বিদায় নিলেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন বরিস ইয়েলৎসিন।

আমার পালেও নতুন হাওয়া লাগায় পাড়ি জমাতে হলো বিলাতে। যোগ দিলাম বিবিসি বাংলা বিভাগে। তত দিনে নতুন দশক শুরু হয়েছে।

রাশিয়া তখন বিবিসির খবরের প্রধান এক বিষয়। বছর দুয়েক কাটলে চেচনিয়া প্রজাতন্ত্র নিজেরাই নাম নিয়ে নিল চেচেন রিপাবলিক অব ইচকেরিয়া। এক গণভোটে এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন দুদায়েভ। ইয়েলৎসিনের সঙ্গে তাঁর কোনো সদ্ভাব ছিল না, শত্রুভাব বরং। দুয়ের মধ্যে গালমন্দেরও কমতি নেই। দুদায়েভ একতরফাভাবে নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করলেন। ইয়েলৎসিন ও দুদায়েভের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ থাকার কারণে কোনো রকম সমঝোতা হতে পারেনি। শুরু হলো চেচনিয়ার বিদ্রোহ।

১৯৯৪-৯৫ সালের প্রাথমিক অভিযান শেষে গ্রজনি বিধ্বংসী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাশিয়ার ফেডারেল বাহিনী চেচনিয়ার পাহাড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা করেছিল। রাশিয়ার জনশক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের যানবাহন, বিমানঘাঁটি ও বিমানসহায়তার দুর্দান্ত সুবিধা সত্ত্বেও চেচেনদের গেরিলাযুদ্ধ এবং সমতলভূমিতে চোরাগোপ্তা হামলা রুশ আক্রমণ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে রাশিয়ার জনসাধারণের সর্বজনীন বিরোধিতায় বরিস ইয়েলৎসিনের সরকার চেচেনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ১৯৯৬ সালে শান্তিচুক্তি করে।

সে যুদ্ধের তীব্রতা বোঝা যাবে পরিসংখ্যান থেকে। রাশিয়ার সামরিক মৃত্যুর সংখ্যা সরকারি হিসাবে ৫ হাজার ৭৩২, অনুমান ১৪ হাজারের বেশি। চেচেন বাহিনীর মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান নেই, তবে

বিভিন্ন অনুমানে তা ৩ হাজার থেকে ১৭ হাজার ৪০০ জন। বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা বিভিন্ন হিসাবে ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ এবং আহতের সংখ্যা ২ লাখ। প্রজাতন্ত্রজুড়ে শহর ও গ্রামগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় ৫ লাখের বেশি লোক আশ্রয়হীন হয়েছিল। যুদ্ধের ফলে চেচেন জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বিবিসিতে চেচনিয়ার যুদ্ধের খবর পরিবেশন করেছি। চেচেন নেতা দুদায়েভের নেতৃত্বে যুদ্ধরত মুক্তিপিয়াসী মানুষের অদম্য মনোবলের খবর জানতে পেরেছি, মুগ্ধ হয়েছি। জেনেছি শহর ও গ্রামগুলোর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলেও চেচেনরা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। নৈকট্য অনুভব করতাম তাদের সঙ্গে।

চেচেনদের ইতিহাস ঘেঁটে হাজি মুরাদের নাম পাই। তলস্তোয়ের *হাজি মুরাদ* আমাকে টেনে নেয়। আমাদেরও তো বিদ্রোহের, গেরিলাযুদ্ধের ইতিহাস আছে। তাই তা অনুবাদ করার ইচ্ছা হয়।

ঔপন্যাসিকার শুরুতে দেওয়া থিসল ফুলটির বাংলা নাম বের করার ইচ্ছাও আমাকে পেয়ে বসে। বাংলায় নিশ্চয়ই তেজি গাছ আছে। কিন্তু সংগৃহীত কোনো ছবিতেই তা কাঁটা গেন্ধালির (নামটি ভুলে গিয়েছিলাম) মতো দেখতে না হওয়ায় কাজটি এগোয়নি। একদিন জুতসই একটি ছবি পেলাম। দুই বোন মোজেজা জহুরা আর ইসরাত জহুরা জানাল আমাদের এলাকায় তার নাম। আমার আলস্যের অজুহাত শেষে অনুবাদের কাজটা করতেই হলো।

ককেশীয় যুদ্ধের পটভূমি

ককেশীয় যুদ্ধ রাশিয়ার তিনটি জার প্রশাসনের সময় সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম আলেকজান্ডারের সময় (১৮০১-২৫), প্রথম নিকোলাসের সময় (১৮২৫-৫৫) এবং দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সময় (১৮৫৫-৮১) সালে। ১৮১৬-২৭ সালে আলেক্সি পেট্রোভিচ ইয়েরোমোলভ, ১৮৪৪-৫৩ সালে মিখাইল সেমিওনিভিচ ভরন্তসভ এবং ১৮৫৩-৫৬ সালে আলেকজান্ডার বারিতিনস্কি শীর্ষস্থানীয় রুশ সেনাপতি ছিলেন।

লেখক মিখাইল লারমন্টোভ ও লিও তলস্তোয় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তলস্তোয় তাঁর *যুদ্ধ ও শান্তি* (*ওয়ার অ্যান্ড পিস*) উপন্যাসে এই যুদ্ধে পাওয়া অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শব্দবন্দী করেছিলেন। রুশ কবি আলেকজান্ডার পুশকিন লর্ড বায়রনের কবিতার ধাঁচে লিখিত 'ককেশাসের

বন্দী' কবিতায় এই যুদ্ধের উল্লেখ করেছিলেন, ১৮২১ সালে তা লেখা হয়েছিল। সাধারণত ককেশীয় যুদ্ধে সেরা রুশ সৈন্যদের নেওয়া হতো; পাশাপাশি রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকেও তাদের বাছাই করা হতো। তাদের মধ্যে ছিল কসাক, আর্মেনীয়, জর্জীয়, ককেশীয় গ্রিক, ওসেটীয়, এমনকি তাতার, বাশকির ও তুর্কমেনীয়রা। কিছু ককেশীয় মুসলমান উপজাতিও রুশদের পক্ষে ককেশাসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

রুশ আক্রমণ ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম দফায় যুদ্ধটি শেষ হয় প্রথম আলেকজান্ডারের মৃত্যু এবং ১৮২৫ সালে ডিসেম্বরপন্থীদের বিদ্রোহের কাকতালীয় কারণে। (ডিসেম্বরপন্থী বিদ্রোহ ২৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম নিকোলাসের বড় ভাই কনস্ট্যান্টিন উত্তরাধিকারসূত্র থেকে সরে যাওয়ার পর প্রথম নিকোলাসের সিংহাসন দখলের প্রতিবাদে রুশ সেনা কর্মকর্তারা আনুমানিক ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ করেন। এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসে ঘটেছিল বলে বিদ্রোহীদের ডিসেম্বরপন্থী বলা হতো।) ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের 'গ্রেট আর্মির' সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়ের তুলনায় বিস্ময়করভাবে কম সাফল্য নিয়ে এটা শেষ হয়।

রাশিয়া ১৮২৬-২৮ সালে পারস্যের সঙ্গে এবং ১৮২৮-২৯ সালে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে। ফলে ১৮২৫-৩৩ সালের মধ্যে ককেশীয়দের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযান চলেনি। তুরস্ক ও পারস্যের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর, রাশিয়া উত্তর ককেশাসের স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ককেশাস যুদ্ধ পুনরায় শুরু করে। রুশ বাহিনী আবারও, বিশেষত গাজি মোল্লা, গামজাতবেক ও হাজি মুরাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ইমাম শামিল তাদের অনুসরণ করেন। তিনি ১৮৫৯ সালে দমিত্রি মিলেউতিনের হাতে বন্দী না হওয়া পর্যন্ত ১৮৩৪ সাল থেকে পাহাড়িদের নেতৃত্ব দেন। ১৮৪৩ সালে শামিল আভারিয়ায় রুশ সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালান। ২৮ আগস্ট উন্তসুকুলে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিন দিক থেকে রুশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে ৪৮৬ জনকে হত্যা করেন। পরবর্তী চার সপ্তাহের মধ্যে শামিল আভারিয়ার একটি বাদে সব রুশ সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করেন এবং ২ হাজারের বেশি রুশ রক্ষীকে হত্যা করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁড়ি দখলের জন্য আভার ও কাজি-কুমুখ নদীর মিলনস্থলে উত্তর অভিযান চালান। শামিলের বাহিনী সবচেয়ে নাটকীয় সাফল্য অর্জন করেছিল প্রিন্স ভরন্তসভের বিশাল রুশ আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়ে।

১৮৫৩-৫৬ সালে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় রুশরা শামিলের সঙ্গে একটি সমঝোতা করেছিল, কিন্তু ১৮৫৫ সালে তা ভেস্তে যায়। ককেশাসের যুদ্ধ শেষ

BanglaBook.org

হয় ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে, জেনারেল বারিয়াতিনস্কির অধীনে ২ লাখ ৫০ হাজার সৈন্যের বাহিনী ককেশীয়দের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার পর।

উত্তর ককেশাসের পূর্ব অংশে যুদ্ধ ১৮৫৯ সালে শেষ হয়। রুশরা শামিলকে ধরে নিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল। জারের প্রতি আনুগত্যে বাধ্য করে তাঁকে কেন্দ্রীয় রাশিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

যাহোক, সির্কাসীয়রা (মূলত ভৌগোলিক বা ভাষাগতভাবে আদিগে, তবে আবখাজ-আবাজাদেরও এদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়) উত্তর-পশ্চিম ককেশীয় জাতিগোষ্ঠী। তারা উত্তর ককেশাসের পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধ পুনরায় শুরু করে। ১৮৬৪ সালের মে/জুনে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। যুদ্ধোত্তর ঘটনাগুলোর মধ্যে উত্তর ককেশীয়দের ইতিহাসের বিয়োগান্ত পরিণতি হলো (বিশেষ করে সির্কাসীয়দের) মুহাজিরবাদ অথবা মুসলিম জনসংখ্যার অটোমান সাম্রাজ্যে স্থানান্তর।

কাজী জাওয়াদ
বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য
নভেম্বর ২০১৯

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হাজি মুরাদ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১

বাড়ি ফিরছিলাম খেতের ভেতর দিয়ে। তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি; খড় কাটা শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে রবিশস্য বোনা। বছরের এই সময়টায় অনেক রকম সুন্দর ফুল ফোটে। যেমন লাল, সাদা বা গোলাপি রঙের সুগন্ধি গোছার ক্লোভার। ঝাঁজালো মিষ্টি গন্ধের দুধসাদা বুনো চন্দ্রমল্লিকা, এই ফুলগুলোর বুকে থাকে উজ্জ্বল হলুদ ফোঁটা। মধুগন্ধি রাইসরিষার হলুদ ফুল। লম্বা ডাঁটার ঘণ্টাকর্ণ, যার নাম সাদা আর লালচে বেগুনি টিউলিপ আকারের ঝুমকা থেকে। আরও ফোটে কলাইয়ের ফুল; হলুদ, লাল ও গোলাপি খোঁচা খোঁচা বোতাম ফুল; হালকা ঘ্রাণের কাষ্ঠকদলী, যার সামান্য গোলাপি আভার বেগুনি পাপড়ি পরিপাটি করে সাজানো। ফোটে যব ফুলের কলি, ভোরের সূর্যে এগুলোর রং উজ্জ্বল নীল, সাঁঝের দিকে বা একটু বড় হলে যা ফিকে ও লাল হয়ে আসে। আর ফোটে কোমল ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণলতা ফুল, গন্ধ যার বাদামের মতো। এই সব বিভিন্ন ফুল দিয়ে একটি তোড়া বানিয়ে বাড়ি রওনা হয়েছি, ঠিক তখনই একটা খাদের মধ্যে দেখলাম টকটকে লাল জাতের পুরো ফোটা চমৎকার একটা কাঁটা গেন্ধালির গোছা, আমাদের এলাকায় এই ফুলের নাম 'তাতার' এবং ফসল বা ঘাস কাটার সময় সবাই খুব সাবধানে এটা এড়িয়ে যায় কিংবা কোনোভাবে কাটা পড়ে গেলে দূরে ফেলে দেয়, যেন হাতে কাঁটা না বেঁধে। ভাবছিলাম কাঁটা গেন্ধালিটা আমার তোড়াটার ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দেব কি না। তাই খাদের নিচে নামলাম। গোছার একটা ফুলের গভীরে ঢুকে মিষ্টি করে ঘুমিয়ে পড়া মখমলের মতো একটা ভ্রমরকে সরিয়ে ফুলটা তুলতে গেলাম। কিন্তু দেখা গেল কাজটা খুব কঠিন। আমার হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও বোঁটার কাঁটা ফুটল সবদিকে। তার ওপর বোঁটাটা এত শক্ত যে ওটার আঁশগুলো একটা একটা করে ছিঁড়তে আমার মিনিট পাঁচেক লেগে গেল। ছেঁড়া শেষ হতে দেখলাম বোঁটাটা পিষে গেছে আর ফুলটাও যেন আগের মতো তাজা আর সুন্দর নেই। আবার ফুলটা শক্ত আর খসখসে হওয়ায় আমার তোড়ার অন্য কোমল ফুলগুলোর সঙ্গে যেন মানাচ্ছিল না। বন্যেরা বনে মানে গাছেই ফুলটা অত্যন্ত সুন্দর। ওটা তোলার

BanglaBook.org

বৃথা চেষ্টায় ফুলটা নষ্ট করে ফেলেছি। আমার খুব খারাপ লাগল এবং আমি ওটাকে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

'কী শক্তি আর নিষ্ঠা! কী রকম সংকল্প নিয়ে সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে এবং নিজের জীবন সে কত চড়া দামে বিকিয়েছে!' ফুলটি তুলতে আমার যা কষ্ট হয়েছে, সেটা মনে করে আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম। বাড়ি যাওয়ার পথটি যে কালো মাটির খেতের ভেতর দিয়ে গেছে, তা কেবল চাষ দিয়ে ওলটানো হয়েছে। আমি ধুলোর পথে উঠলাম। চষা খেতটা একজন জমিদারের এবং এত বড় যে পাশের দুই দিকে এবং আমার সামনে পাহাড়টার চূড়া পর্যন্ত হাল দিয়ে কাটা সীতা আর ভেজা মাটি ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাচ্ছিল না। জমিটা খুব ভালো করে চষা হয়েছে, কোথাও একটা ঘাসের পাতা বা অন্য কোনো আগাছা চোখে পড়ে না; পুরোটাই কালো। 'আহ্, মানুষ যে কী ধ্বংসাত্মক প্রাণী... নিজে বাঁচার জন্য কত ধরনের গাছগাছালির জীবন সে ধ্বংস করে!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণহীন ওই কালো জমিটায় জীবিত কোনো কিছুর খোঁজে চারদিকে দেখতে দেখতে আমি ভাবছি। আমার সামনে, রাস্তার ডান দিকে একটা ঝোপ দেখতে পেলাম, কাছে গিয়ে দেখি আমি যে জাতের কাঁটা গেন্ধালি ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি, সেগুলোই। এই তাতার গাছটিতে তিনটি ডাঁটা। তার একটা কাটা হাতের মতো মুড়ে পড়ে আছে। বাকি দুটোয় একটা করে ফুল, আগে লাল ছিল কিন্তু এখন কালো হয়ে গেছে। একটা মাঝবরাবর ভেঙে ঝুলে আছে, সেটার ফুলে মাটি লেপ্টে গেছে। অন্য ডালটা কালো মাটিতে লেপে গেলেও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় কোনো এক্কা গাড়ির চাকা গাছটাকে মাড়িয়ে গেছে, কিন্তু তারপর ওটা আবার দাঁড়িয়েছে। তাই সোজা হয়ে উঠলেও একদিকে মোচড়ানো, যেন এর গা থেকে এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নেওয়ায় এর ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে আর এর একটা চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে; তারপরও এটা অটলভাবে দাঁড়িয়ে এবং হার মানেনি মানুষের কাছে, যারা গাছটির চারপাশের অন্য সব ভাইকে শেষ করে দিয়েছে...

'কী তেজ!' আমি ভাবলাম। 'মানুষ সবকিছু জয় করেছে এবং হাজার হাজার গাছ ধ্বংস করেছে, তারপরও এটা বশ্যতা স্বীকার করবে না।' আমার মনে পড়ল বেশ কয়েক বছর আগের একটি বৈকেশীয় কাহিনি, যার কিছুটা আমি নিজে দেখেছি, কিছুটা চাক্ষুষদর্শীদের কাছে শুনেছি এবং বাকিটা আমার কল্পনা।

সে কাহিনি আমার স্মৃতি ও কল্পনায় যেভাবে এসেছে, তা-ই নিচে দেওয়া হলো।

BanglaBook.org

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৫১ সালের শেষ দিকে।

নভেম্বরের শীতে এক সন্ধ্যায় হাজি মুরাদ ঘুঁটে পোড়ার গন্ধে ভরা বৈরী চেচেন গ্রাম মাখকেতের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। গ্রামটি রাশিয়ার সীমা থেকে মাইল পনেরো দূরে। মুয়াজ্জিনের আজান কেবল শেষ হয়েছে। (মৌচাকের কোষগুলোর মতো সাজানো) মাটির ঘরগুলোয় ফিরে আসা গরুর অনুচ্চ হাম্বা এবং ভেড়ার ভ্যা ভ্যা আওয়াজ। সে শব্দ ছাপিয়ে ঘুঁটের ধোঁয়ায় মিশেল খাওয়া পরিষ্কার পাহাড়ি বাতাসে ভেসে আসা পুরুষদের চাপা গলায় তর্ক এবং কাছে নিচের ঝরনা থেকে মহিলা ও শিশুদের কথাবার্তা তিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেন।

হাজি মুরাদ ছিলেন শামিলের নায়েব, নিজের কীর্তিকলাপের জন্য বিখ্যাত। কখনো নিজের ঝান্ডা ছাড়া ঘোড়ায় চড়েননি। সব সময় তার সঙ্গে কয়েক ডজন মুরিদ থাকত, যারা তার আগে আগে ঘোড়া কোনাকুনি করে চলত। এখন যতটা সম্ভব নজর এড়ানোর চেষ্টায় লম্বা চাদর মুড়ি দিয়ে মাত্র একজন মুরিদ নিয়ে তিনি পালাচ্ছেন, তার চাদরের নিচ দিয়ে একটা রাইফেলের নল বের হয়ে আছে আর তার কালো চোখের দৃষ্টি পথে দেখা লোকদের মুখ ভেদ করে গেছে।

গ্রামটিতে ঢোকার সময় যে রাস্তা গ্রামের খোলা চত্বরে নিয়ে যায়, হাজি মুরাদ সেটায় যাননি, বামে ঘুরে একটা চাপা গলি ধরলেন; পাহাড়ের ঢালে কাটা দ্বিতীয় মাটির কুঁড়েটার কাছে গিয়ে থেমে এবং চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সামনের বারান্দাটায় কেউ ছিল না; কুঁড়েঘরটার চালে সদ্য লেপা মাটির চিমনিটার পেছনে একটা লোক ভেড়ার চামড়ায় বানানো গরম কাপড় গায়ে শুয়ে ছিল। হাজি মুরাদ তার চামড়ায় মোড়া চাবুকটার হাতল দিয়ে লোকটাকে স্পর্শ করলেন এবং জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করলেন। নিচ থেকে একটা বুড়ো লোক বের হয়ে এল, তার গায়ে তেলচিটে পুরান চেরশমেত (ককেশীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত কাফতান-জাতীয় পোশাক) আর মাথায় ঘুমানোর টুপি। তার ভেজা লাল চোখের পাতায় কোনো পাপড়ি ছিল না, সেগুলোর জোড়া ছাড়ানোর জন্য সে পিটপিট করল। হাজি মুরাদ 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে তার মুখের চাদর সরালেন। 'ওয়ালাইকুম আস্সালাম' বলল বুড়ো লোকটি। হাজি মুরাদকে চিনতে পেরে সে হাসল ফোকলা মুখে; তার পাতলা পা দুটোয় ভর করে উঠে সে চিমনির পাশে রাখা কাঠের খড়মে পা দুটো গলাতে শুরু করল। তারপর অলসভাবে তার ভেড়ার চামড়ার দোমড়ানো গরম কাপড়টিতে হাত ঢুকিয়ে দিল, চালের সঙ্গে ঠেস দেওয়া মইটার কাছে গিয়ে সে পেছন ফিরে নেমে এল। কাপড় পরা এবং নেমে আসার সময় তার রোদে পোড়া কোঁচকানো চিকন ঘাড়ের ওপর মাথাটা সে

BanglaBook.org

নাড়াচ্ছিল আর ফোকলা মুখে বিড়বিড় করছিল। মাটিতে নেমেই সে হাজি মুরাদকে সাদরে নামানোর জন্য তার ঘোড়ার লাগাম এবং ডান দিকের পাদানিতে হাত দিল; কিন্তু হাজি মুরাদের সঙ্গী করিতকর্মা জোয়ান মুরিদটি লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বুড়োকে ইশারায় এক পাশে সরিয়ে দিয়ে নিজে তার জায়গা নিল। হাজি মুরাদও নেমে একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে বারান্দার নিচে বসলেন। ঘরের দরজা দিয়ে বছর পনেরোর একটি ছেলে তাড়াতাড়ি বের হয়ে বঁইচির মতো কালো স্থির চোখে অতিথিদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

হাজি মুরাদের জন্য ক্যাঁচক্যাঁচে পাতলা দরজাটা খুলতে খুলতে বুড়ো লোকটি ছেলেটাকে হুকুম করল, 'দৌড়ে মসজিদে গিয়ে তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকতেই হাজি মুরাদ দেখলেন, লাল বেশমেতের ওপর ঘন কুঁচি দেওয়া জামা এবং চওড়া নীল পায়জামা পরা হালকা-পাতলা গড়নের এক মধ্যবয়সী মহিলা ভেতরের দরজা দিয়ে বের হয়ে আসছে, হাতে তার কয়েকটি তাকিয়া।

'আপনার আগমন আমাদের জন্য সুখ নিয়ে আসুক!' বলে সে শরীরটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে নিচু হয়ে অতিথির বসার জন্য সামনের দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়াগুলো সাজাতে লাগল।

চাদর, রাইফেল ও তলোয়ার খুলে বুড়োর হাতে দিতে দিতে হাজি মুরাদ জবাব দিলেন, 'আপনার ছেলেরা দীর্ঘজীবী হোক!' ঘরটির দেয়াল মাটির আস্তর দেওয়া এবং সাবধানে চুনকাম করা। বুড়ো পরিষ্কার দেয়ালে ঝোলানো দুটো চকচকে বড় গামলার মাঝখানে বাড়ির কর্তার অস্ত্রগুলোর পাশের একটি পেরেকে রাইফেল ও তলোয়ারটি সাবধানে ঝুলিয়ে রাখল।

হাজি মুরাদ তার পিঠের পিস্তলটি নাড়িয়ে ঠিক করে তাকিয়াগুলোর কাছে এসে তার চাপকানটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসে পড়লেন। বুড়ো খোলা গোড়ালি নিয়ে উবু হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে হাত দুটো তুলল মোনাজাতের ভঙ্গিতে। হাজি মুরাদও তাই করলেন। তারপর আবার দোয়া করে দুজনেই হাতের তালু মুখে লাগিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে দাড়ির শেষ প্রান্তে দুহাত মেলালেন।

'নতুন কোনো খবর আছে?' বুড়ো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন হাজি মুরাদ।

'না, নতুন কিছু নেই', তার নিষ্প্রাণ চোখ দুটো দিয়ে হাজি মুরাদের মুখের দিকে নয়, বুকের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল বুড়ো। 'আমি মৌমাছির খামারে থাকি এবং আজই শুধু ছেলেকে দেখার জন্য এসেছি...সে জানে।'

BanglaBook.org

হাজি মুরাদ বুঝতে পারলেন, বুড়ো যা জানে এবং হাজি মুরাদ যা জানতে চান, তা বলতে চাচ্ছে না, তাই আলতো করে মাথা নাড়িয়ে তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

'কোনো ভালো খবর নেই,' বলল বুড়ো। 'একটাই খবর হলো খরগোশগুলো আলোচনা করছে ইগলগুলোকে কীভাবে তাড়ানো যায়; আর ইগলগুলো প্রথমে একটাকে ছিঁড়ে খায়, তারপর তাদের আরেকটাকে। আরেক দিন রাশিয়ার কুকুরগুলো মিতচিত গ্রামে খড়ে আগুন দিয়েছে...ওদের মুখগুলো পুড়ুক!' রেগে কর্কশ গলায় সে বলল।

মাটির মেঝেয় আস্তে তার সবল পা ফেলে হাজি মুরাদের মুরিদ ঘরে ঢুকল, তার ছোরা আর পিস্তলটা রেখে চাদর, রাইফেল আর তলোয়ার খুলে হাজি মুরাদের অস্ত্রগুলো যে পেরেকে লটকানো ছিল, সেটাতেই ঝুলিয়ে দিল।

নবাগতের দিকে দেখিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?'

'আমার মুরিদ। নাম এলডার,' জবাব দিলেন হাজি মুরাদ।

'খুব ভালো,' এই কথা বলে বুড়ো তাকে হাজি মুরাদের পাশে একটুকরো কম্বলে বসার ইশারা করল। এলডার আসন করে বসে তার ভেড়ার চোখের মতো সুন্দর চোখ দিয়ে ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করা বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকল। বুড়ো বলছিল কী করে তাদের সাহসী বন্ধুরা আগের সপ্তাহে দুজন রুশ সেনাকে ধরে ফেলে এবং একজনকে মেরে ফেলে আর অন্যজনকে ভেদেনোয় শামিলের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

হাজি মুরাদ তার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন না, বাইরে কিছু আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল আর ঘরে ঢুকল বাড়ির কর্তা সাদো। তার বয়স প্রায় চল্লিশ, অল্প দাড়ি, খাড়া নাক এবং তাকে বাড়িতে ডেকে আনতে তার পনেরো বছরের যে ছেলেটি গিয়েছিল, তার মতোই কালো চোখ, তবে তত উজ্জ্বল নয়, ছেলেটিও বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকে বসল দরজার পাশে। বাড়ির কর্তা তার খড়ম খুলে রেখেছে চৌকাঠের কাছে, তারপর তার পুরোনো অসংখ্যবার পরা টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে (অনেক দিন কামানো হয়নি বলে মাথার কালো চুল বড় হয়ে গেছে) হুট করে উবু হয়ে বসল হাজি মুরাদের সামনে।

বুড়োর মতো করে মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত উঠিয়ে দোয়া পড়ে সে-ও হাত দুটো মুখের ওপর থেকে দাড়ির প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়ে আনল। দোয়া পড়া শেষ হলেই কেবল সে কথা বলতে শুরু করল। সে বলল কেমন করে শামিলের কাছ থেকে হাজি মুরাদকে জীবিত বা মৃত ধরার আদেশ এসেছে;

BanglaBook.org

শামিলের চরেরা আগের দিনই ঘুরে গেছে, লোকেরা শামিলের অবাধ্য হতে ভয় পাচ্ছে এবং তাই সাবধান হওয়া দরকার।

'আমার বাড়িতে,' সাদো বলল, 'আমি জীবিত থাকতে কেউ আমার অতিথির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু খোলা মাঠে কী হবে?...আমাদের এটা ভাবতে হবে।'

হাজি মুরাদ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন। সাদোর কথা শেষ হলে তিনি বললেন, 'বেশ, আমরা তাহলে একটা লোককে দিয়ে রুশদের কাছে একটা চিঠি পাঠাব। আমার মুরিদ যাবে, কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন লোক লাগবে।'

'আমি বাটা ভাইকে দিয়ে দেব,' সাদো বলল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ছেলেকে বলল, 'যা তো, বাটাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল যেন তার পায়ে স্প্রিং লাগানো, তারপর হাত দুলিয়ে ছুটে কুঁড়ে থেকে বের হয়ে গেল। মিনিট দশেক পর সে ফিরে এল একজন খাটো পায়ের পেশিবহুল চেচেনকে সঙ্গে নিয়ে, রোদে পুড়ে তার শরীর প্রায় কালো, গায়ে পুরোনো টুটাফাটা হলুদ চাপকান, যার হাতার কিছু অংশ খসে পড়েছে, আর পরনে দলামোচড়া কালো আঁটসাঁট পাতলুন।

হাজি মুরাদ আগতকে সালাম দিলেন এবং আর একটা কথাও না বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমার মুরিদকে রুশদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

'আমি পারব,' সোৎসাহে উত্তর দিল বাটা। 'আমি নিশ্চয়ই পারব। আর কোনো চেচেন নেই যে আমার মতো পার হতে পারবে। অন্য কেউ হয়তো যেতে রাজি হবে, যে কোনো ওয়াদা করবে কিন্তু কাজ কিছুই পারবে না; আমিই করতে পারব!'

'ঠিক আছে,' হাজি মুরাদ বললেন। তিনটি আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার কষ্টের জন্য তিন রুবল পাবে।'

বাটা মাথা নাড়িয়ে জানাল সে বুঝতে পেরেছে এবং বলল যে সে টাকার জন্য লোভী নয়, কাজটা সে করছে শুধু হাজি মুরাদের কাজ করতে পারার সম্মানের জন্য। পাহাড়ের সবাই হাজি মুরাদ সম্বন্ধে জানত এবং জানত সে কীভাবে রুশ গুয়োরকে জবাই করেছে।

'ঠিক আছে...দাড়ি লম্বা আর কথা খাটো হওয়া উচিত,' বললেন হাজি মুরাদ।

বাটা বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাহলে চুপ করলাম।'

'খাড়া পাহাড়ের কাছে আরগুন নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বনের

BanglaBook.org

ফাঁকা জায়গাটায় দুটো চাঁই আছে, তুমি চেনো?' হাজি মুরাদ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, চিনি।'

'সেখানে চারজন ঘোড়সওয়ার আমার জন্য অপেক্ষা করছে,' বললেন হাজি মুরাদ।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল বাটা।

'সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে খান মাহোমা কে? সে জানে কী করতে হবে আর কী বলতে হবে। তুমি তাকে রুশ সেনাপতি প্রিন্স ভরন্তসভের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না?'

'আমি তাকে নিয়ে যাব।'

'তাকে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। পারবে?'

'পারব।'

'তাকে নিয়ে যাও আর বনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমিও সেখানে অপেক্ষা করতে থাকব।'

'আমি তা-ই করব,' উঠতে উঠতে বলল বাটা আর বুকের ওপর তার হাত দুটো রেখে বের হয়ে গেল।

বাটা চলে যাওয়ার পর হাজি মুরাদ ফিরলেন গৃহকর্তার দিকে।

'একটা লোককে চেখিতেও পাঠাতে হবে', তিনি বলতে শুরু করলেন এবং তার চাপকানের গুলির থলেগুলোর একটা হাতে নিতেই দুজন মহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তা রেখে দিলেন।

তাদের একজন সাদোর স্ত্রী—পাতলা গড়নের মধ্যবয়সী যে মহিলা আগে হাজি মুরাদের জন্য তাকিয়া সাজিয়ে দিয়েছিল। অন্য মেয়েটি অল্প বয়সী, লাল পায়জামা আর একটা সবুজ বেশমেত পরেছে। রুপোর টাকার একটা মালা তার পোশাকের সামনের দিকের পুরোটাই ঢেকে রেখেছে। তার ঘন কালো চুলের বেণিটা লম্বা না হলেও বেশ মোটা। তার কাঁধের পাতলা হাড়ের ফলক দুটোর মাঝখানে বেণির শেষ প্রান্তে একটা রুপোর রুবল ঝুলছে। বাবা ও ভাইয়ের চোখের মতো তার চোখ দুটোও বঁইচি ফলের মতো কালো। তার কচি মুখে জ্বলজ্বল করছে আর মুখটা চেষ্টা করছে বড়দের মতো শক্ত হতে। সে অতিথিদের দিকে তাকায়নি কিন্তু তাদের উপস্থিতি ঠিকই বুঝতে পারছিল।

সাদোর স্ত্রী একটা নিচু গোলটেবিল নিয়ে এল, যেটার ওপরে চা, মাখনে ভাজা পিঠা, পনির, রুমালি রুটি আর মধু। মেয়েটি নিয়ে এসেছে একটা গামলা, একটা বদনা আর একটা তোয়ালে।

পয়সার গয়নাগুলোয় টুংটাং শব্দ তুলে মেয়েরা যতক্ষণ অতিথিদের জন্য

BanglaBook.org

আনা জিনিসগুলো সাজিয়ে সামনে দিতে পাতলা চটি পরা নরম পায়ে চলাফেরা করছিল, সাদো আর হাজি মুরাদ ততক্ষণ নীরব ছিলেন। ভেড়ার চোখের মতো চোখ দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে ভাঁজ করা পা দুটোর দিকে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে ছিল এলডার, মেয়েরা ঘরের মধ্যে থাকার পুরো সময়টায়। তারা চলে যাওয়ার পর তাদের হালকা পায়ের আওয়াজ দরজার পেছন থেকে যখন আর শোনা যাচ্ছিল না, কেবল তখন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

হাজি মুরাদ চাপকানের একটা গুলির থলেতে আটকে যাওয়া একটা গুলি বের করে ওটার নিচ থেকে একটা পাকানো নোটও বের করে আনলেন। নোটটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার ছেলেকে এটা দিতে হবে।'

'পৌঁছে সংবাদ কাকে দিতে বলব?'

'তোমাকে, আর তুমি জানিয়ে দেবে আমাকে।'

'এটা করা হবে,' বলে সাদো নোটটা তার নিজের কোটের একটা গুলির পকেটে রাখল। তারপর পিতলের বদনাটা হাতে নিয়ে গামলাটা হাজি মুরাদের দিকে এগিয়ে দিল।

হাজি মুরাদ তার সাদা পেশিবহুল হাতের ওপর থেকে বেশমেতের আস্তিন একটু গুটিয়ে সাদোর বদনা থেকে ঢালা পরিষ্কার ঠান্ডা পানির নিচে হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। আনকোরা তোয়ালেতে হাত মুছে হাজি মুরাদ ঘুরে বসলেন টেবিলটার দিকে। এলডারও একই কাজ করল। অতিথিদের খাওয়ার সময় মুখোমুখি বসে তাদের আগমনের জন্য বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানাল সাদো। দরজার পাশেই তার জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে হাজি মুরাদের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে বসে থাকা সাদোর ছেলেটি একটু মুচকি হাসল যেন বাবার কথাতেই সায় দিতে।

গত চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময়ে হাজি মুরাদ কিছুই না খেলেও এখন সামান্য একটু রুটি আর পনির খেলেন। তারপর তার ছোরার খাপ থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে তা দিয়ে রুটির টুকরোয় একটু মধু মাখালেন।

'আমাদের মধু ভালো,' হাজি মুরাদকে মধু খেতে দেখে খুশি হয়ে বুড়ো বলল। 'এবার অন্য সব বছরের চেয়ে অনেক বেশি আর ভালো হয়েছে।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' বলে হাজি মুরাদ টেবিল থেকে সরে বসলেন। এলডার আরও খেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তার নেতার অনুসরণ করল এবং টেবিল থেকে সরে বদনা আর গামলাটা এগিয়ে দিল হাজি মুরাদের দিকে।

সাদো জানত সে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে হাজি মুরাদকে বাড়িতে বসিয়ে। কারণ, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বের পর শামিল চেচনিয়ার সব বাসিন্দার ওপর হুকুম দিয়েছে হাজি মুরাদকে আশ্রয় দিলে তাদের মরতে হবে। সে জানত, গ্রামবাসী যেকোনো মুহূর্তে তার বাড়িতে হাজি মুরাদের উপস্থিতি টের পেয়ে

BanglaBook.org

যেতে পারে এবং তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করতে পারে। এটাতে সে কেবল ভয়ই পায়নি, কিছুটা মজাও পেয়েছিল। সে ভাবছিল, জীবন দিয়ে হলেও অতিথিকে রক্ষা করা তার কর্তব্য এবং তার কর্তব্য করতে পারার জন্য সে গর্ববোধ করছিল আর নিজের ওপর খুশি ছিল।

'আমার ঘাড়ের ওপর মাথাটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না,' সে আবার বলল হাজি মুরাদকে।

হাজি মুরাদ সাদোর চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন সে সত্যি বলছে, তারপর দোয়া করার মতো বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী আর সুখী হও!'

এ ধরনের কথায় খুশি হয়ে সাদো নীরবে তার হাত বুকের ওপর রাখল।

কুঁড়ের দরজা বন্ধ করে আগুনে কিছু খড়ি দিয়ে সাদো অত্যন্ত খুশিমনে ঘর থেকে কুঁড়ের যেদিকটায় তার পরিবারের সবাই থাকে, সেদিকে চলে গেল। মেয়েরা তখনো ঘুমায়নি এবং তাদের মেহমানখানায় রাত কাটানো বিপজ্জনক অতিথিদের সম্বন্ধে কথা বলছিল।

২

হাজি মুরাদ যে গ্রামে রাত কাটাচ্ছিলেন, সেখান থেকে পনেরো ভার্স্ত (দৈর্ঘ্যের রুশ মাপ, এক মাইল প্রায় দেড় ভার্স্তের সমান) দূরে সীমান্তের দুর্গ ভজভিঝেনস্ক। দুর্গ থেকে শাহগিরনস্কি ফটক দিয়ে তিনজন সৈন্য ও একজন এনসিও (ননকমিশন্ড অফিসার) কুচকাওয়াজ করে বের হয়ে এল। ককেশাসে রুশ সৈন্যদের তখনকার পোশাক ছিল উরু পর্যন্ত লম্বা ভেড়ার চামড়ার কোট, ফারের টুপি এবং হাঁটু অবধি লম্বা বুট। চারজনের দলটির সবার পরনে তেমন পোশাক আর পিঠে ঝোলানো ভাঁজ করা পশমি আলখাল্লা। অস্ত্র কাঁধে নিয়ে সৈন্যরা প্রথমে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। তারপর প্রায় ৫০ কদম গিয়ে ঘুরল। ডান দিকে গেল প্রায় ২০ কদম তাদের বুট দিয়ে শুকনা পাতায় মচমচ শব্দ করে। তারা থামল সেখানে পড়ে থাকা একটা চিনার গাছের গুঁড়ির কাছে। গুঁড়িটা এত কালো যে অন্ধকারেও ওটাকে দেখা যাচ্ছিল। এই চিনারের গুঁড়িটা তাদের ওত পেতে থাকার জায়গা।

সৈন্যরা বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার সময় গাছগুলোর ওপর দিয়ে উজ্জ্বল তারাগুলোও তাদের সঙ্গে আসছিল বলে মনে হচ্ছিল। সেগুলো এখন স্থির, পাতাহীন ডালগুলোর মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করছিল।

BanglaBook.org

'ভাগ্য ভালো যে এটা শুকনা,' সার্জেন্ট পানভ বলল, তারপর কাঁধ থেকে খটাং করে রাইফেল আর বেয়নেটটা নামিয়ে চিনারের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে রাখল। সৈন্য তিনটিও একই কাজ করল।

'নিশ্চয়ই আমি ওটা হারিয়েছি!' খেঁকিয়ে বিড়বিড় করল পানভ। 'নিশ্চয়ই রেখে এসেছি, নাহয় পথে কোথাও পড়ে গেছে।'

'কী খুঁজছ?' উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল একজন সৈন্য।

'আমার পাইপের বোলটা। শয়তানটা যে কোথায় গেল?'

'নলটা কি তোমার কাছে আছে?' জিজ্ঞেস করল সৈন্যটা।

'এই তো নলটা।'

'তাহলে এটা সোজা মাটিতে পুঁতে ফেলছ না কেন?'

'ওটার দরকার নেই!'

'দাঁড়াও, এক মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলব।'

ওত পাতার সময় ধূমপান নিষেধ, কিন্তু এটা নামেই ওত পাতা। বরং এটাকে বলা যায় পাহারাচৌকি। আগে পাহাড়িরা লুকিয়ে কামান নিয়ে এসে দুর্গের দিকে গোলা ছুড়ত। সেটা যাতে করতে না পারে, সে জন্য এই পাহারার ব্যবস্থা। পানভ ধূমপানের আনন্দ বাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি, তাই উৎসাহী সৈন্যটার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। সৈন্যটা তার পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ল। ওটার চারদিক সমান করে পাইপের নলটা তার মধ্যে লাগিয়ে দিল, তারপর সে গর্তটা তামাক দিয়ে ভরে চেপে দিল; তৈরি হয়ে গেল পাইপ। গন্ধকের দেশলাই মুহূর্তের জন্য জ্বলে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়া সৈন্যটির চওড়া চোয়ালে আলো ফেলল। নলের ভেতর দিয়ে বাতাস হিস হিস করছিল, পোড়া তামাকের মিষ্টি গন্ধ গেল পানভের নাকে।

'ঠিক করেছ?' উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'কেন নয়, অবশ্যই!'

'তুমি একাট চটপটে ছেলে, আভদিয়েভ!...একজন বিচারকের মতো বিজ্ঞ! তাহলে বেটা।'

আভদিয়েভ মুখ থেকে ধোঁয়া বের হতে দিয়ে পানভের জন্য জায়গা করে দিতে গড়িয়ে পাশ ফিরল।

উন্মুখ পানভ শুয়ে পড়ে নলের মুখের দিকটা হাতা দিয়ে মুছে তামাক টানতে শুরু করল।

ধূমপান করার সময় সৈন্যরা কথা বলতে শুরু করল।

'সবাই বলছে কমান্ডার আবার ক্যাশ-বাক্স হাতিয়েছে,' অলস কণ্ঠে একজনের মন্তব্য। 'জুয়া খেলায় সে হেরেছে, জানো?'

BanglaBook.org

'সে আবার ফেরত দিয়ে দেবে,' পানভ বলল।

'অবশ্যই সে দেবে! সে একজন ভালো অফিসার,' সায় দিল আভদিয়েভ।

'বেশ! বেশ!' যে এই আলাপ শুরু করেছিল, হতাশভাবে সে বলল। 'আমার মতে কোম্পানির (সেনাদল) উচিত তার সঙ্গে কথা বলা। তুমি যদি টাকা নিয়ে থাকো, তাহলে বলো কত নিয়েছ এবং কখন তা ফেরত দেবে।'

'কোম্পানি যদি ঠিক করে, তাহলে সেটাই হবে,' পাইপ থেকে সরে গিয়ে বলল পানভ।

'অবশ্যই। দশে মিলি করি কাজ,' প্রবাদটি বলে সায় দিল আভদিয়েভ।

'বসন্তের আগে যব আর বুট কিনতে হবে। তখন টাকা লাগবে, সে যদি টাকা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে, তাহলে কী হবে?' নাখোশ সৈন্যটি বলল।

'আমি তোমাকে বলছি কোম্পানির যা ইচ্ছা তা-ই হবে,' আবার বলল পানভ। 'এটাই প্রথম না সে টাকা নেয়, আবার ফেরত দিয়ে দেয়।'

তখনকার দিনে ককেশাসে প্রতিটা কোম্পানি তার রসদ বিভাগ চালানোর জন্য নিজেরাই লোক ঠিক করত। তারা রাজস্ব বিভাগ থেকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা (৬ রুবল ৫০ কোপেক) পেত এবং কোম্পানির খাবারের ব্যবস্থা করত। তারা বাঁধাকপি চাষ করত, খড়ের গাদা বানাত, তাদের নিজেদের এক্কা থাকত এবং তাদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলো নিয়ে তারা গর্ব করত। কোম্পানির টাকা রাখা হতো একটা সিন্দুকে, যেটার চাবি থাকত কমান্ডারের কাছে; প্রায়ই সে সিন্দুক থেকে টাকা ধার নিত। তেমন ঘটনাই আবার ঘটেছে, সৈন্যরা যা নিয়ে আলাপ করছিল। নাখোশ সৈন্যটি, নিকতিন, চায় কমান্ডারের কাছ থেকে হিসাব চাওয়া হোক, আর পানভ ও আভদিয়েভ মনে করে তার দরকার নেই।

পানভের পর নিকতিন ধূমপান করল, তারপর তার আলখাল্লাটা বিছিয়ে তার ওপর বসল চিনারের গুঁড়িটিতে হেলান দিয়ে। সবাই তখন নিশ্চুপ। কেবল তাদের মাথার অনেক ওপরে গাছের মগডালের পাতাগুলো বাতাসে মর্মর শব্দ করছিল। সেই অবিরাম মৃদু মর্মর শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ শুরু হলো শিয়ালের হুক্কাহুয়া, গোঙানি, আর্তনাদ ও খুক খুক হাসি।

'শোন, ওই লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ারগুলো শোনো কী রকম চিল্লাচ্ছে!'

'ওরা তোমার হেঁড়ে গলা শুনে হাসছে,' চিকন গলায় বলল ইউক্রেন থেকে আসা সৈন্যটা।

আবার সব নিস্তব্ধ। শুধু বাতাস গাছের ডালগুলো দোলাচ্ছে কখনো তারাগুলো ঢেকে দিয়ে, কখনো খুলে।

'শোনো, পানভ,' হঠাৎ প্রফুল্ল মেজাজে জিজ্ঞেস করল আভদিয়েভ, 'তোমার কি কখনো মন খারাপ লাগে?'

BanglaBook.org

'মন খারাপ, কেন?' কোনো গা না করেই জবাব দিল পানভ।

'বেশ, আমার মন খারাপ লাগে, কোনো কোনো সময় এত খারাপ লাগে যে জানি না আমি আমার কী করে ফেলতে পারি।'

'ও, এই কথা!' এটুকুই পানভের জবাব।

'সেইবার আমি যখন সব টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলাম, ওটা মন খারাপের জন্যই হয়েছিল। তা আমাকে ধরে ফেলেছিল, এমনভাবে ধরে ফেলেছিল যে আমি মনে মনে বললাম, আমি বেহেড মাতাল হয়ে যাব!'

'কিন্তু কখনো কখনো মদ খেলে তা আরও খারাপ হয়।'

'হ্যাঁ, আমারও তা-ই হয়েছিল। কিন্তু একজন নিজেকে নিয়ে কী করতে পারে?'

'কিসের জন্য তোমার এত মন খারাপ হয়?'

'আমার, কী...কেন, আমার বাড়ির জন্য মন টানে।'

'তাহলে তোমাদের কি অবস্থাপন্ন বাড়ি?'

'না, আমরা ধনী নই, কিন্তু স্বচ্ছন্দে চলে যায়। আমরা ভালো আছি।' এরপর আভদিয়েভ পানভের কাছে বহুবার বলা কাহিনি আবার বলতে শুরু করল।

'দেখো, আমি আমার নিজের ইচ্ছায় ভাইয়ের বদলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি,' আভদিয়েভ বলল। তার (ভাইয়ের) বাচ্চাকাচ্চা আছে। পরিবারে তারা পাঁচজন। আর আমি কেবল বিয়ে করেছি। মা এসে আমাকে যাওয়ার জন্য মিনতি করতে থাকল। তাই আমি ভাবলাম, বেশ, তারা হয়তো মনে রাখবে আমি কী করেছি। তাই আমি আমার মালিকের কাছে গেলাম...সে ভালো মনিব ছিল, বলল, তুমি একটা ভালো লোক, যাও! তাই আমি আমার ভাইয়ের বদলে গেলাম।'

'বেশ, সেটা ভালো কাজ করেছ,' পানভ বলল।

'তারপর দেখো পানভ, আমাকে বিশ্বাস করো, আমার যে মন খারাপ হয়, তার বড় কারণ সেই ঘটনা। কেন তুমি তোমার ভাইয়ের বদলে গেলে? আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। সে এখন সেখানে রাজার হালে থাকছে, আর আমি এখানে কষ্ট করে মরছি। আমি যত চিন্তা করি, আমার তত খারাপ লাগে...মনে হয় আমার কপালই খারাপ!'

আভদিয়েভ চুপ করে গেল।

একটু থেমে সে বলল, 'আমরা বোধ হয় আরেকবার ধূমপান করতে পারি।'

'ঠিক আছে, বানাও!'

কিন্তু সৈন্যদের ধূমপান করার সুযোগ হলো না। আভদিয়েভ পাইপের

BanglaBook.org

নলটি ঠিকমতো বসানোর জন্য উঠতেই তারা গাছের মর্মর শব্দ ছাপিয়ে রাস্তায় পায়ের আওয়াজ পেল। পানভ তার বন্দুক তাক করে ধরল এবং নিকিতিনকে তার পা দিয়ে ধাক্কা দিল।

নিকিতিন উঠে তার পশমি আলখাল্লাটা তুলে নিল।

বন্দারেঙ্কো নামের তৃতীয় সৈন্যটাও উঠল এবং বলল, 'বন্ধুরা, আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম...।'

'শসস!' ইশারা করল আভদিয়েভ, সৈন্যরা সবাই দম বন্ধ করে শুনল। একাধিক মানুষের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, নাল লাগানো বুট পরা পায়ের নয়। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঝরা পাতা আর ডালের টুকরার ওপর মচমচ শব্দ পরিষ্কার থেকে বেশি পরিষ্কার হয়ে আসছে। তারপর এল গলার খাদ থেকে আসা বিশেষ শব্দ। কথা বলার সময় চেচেনরা এমন শব্দ করে। সৈন্যরা এখন কেবল শব্দই শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পেল গাছগুলোর মধ্যে ফাঁকা জায়গা দিয়ে দুটো ছায়া হেঁটে যাচ্ছে, একটা ছায়া অন্যটার চেয়ে লম্বা। ছায়াগুলো সৈন্যদের বরাবর এলে পানভ হাতে বন্দুক নিয়ে রাস্তার ওপর উঠে এল, তার সহকর্মীরা তার অনুসরণ করল।

'কে যায়?' হাঁক দিল সে।

'আমি, বন্ধু চেচেন,' খাটো লোকটি বলল। লোকটা বাটা। 'বন্দুক নাই, তলোয়ার নাই!' নিজের দিকে দেখিয়ে বলল সে। 'প্রিন্সকে চাই!'

লম্বা লোকটি বন্ধুর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছেও কোনো অস্ত্র ছিল না।

'সে বলছে যে তাকে খবর নিতে পাঠানো হয়েছে, কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়,' পানভ তার সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলল।

'প্রিন্স ভরন্তসভ...বেশি চাই! বড় কাজ!' বলল বাটা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমরা তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব,' পানভ বলল। 'তুমি বরং এদের নিয়ে যাও,' আভদিয়েভকে বলল, 'তুমি আর বন্দারেঙ্কো, এদের ডিউটি অফিসারের কাছে দিয়ে ফিরে এসো। মনে থাকবে?' সে আরও বলল, 'সাবধান, এদের তোমাদের সামনে রাখবে!'

'এটা করলে কেমন হয়?' আভদিয়েভ তার বন্দুক আর বেয়নেট দিয়ে কাউকে খোঁচানোর ভঙ্গি করে বলল। 'আমি যদি এক খোঁচায় তার ভুঁড়ি বের করে দিই?'

'তুমি তাকে মেরে ফেললে তার কী দাম থাকবে?' মন্তব্য বন্দারেঙ্কোর।

'এখন হাঁটো!'

খবর নিতে আসা লোকদের নিয়ে যাওয়া সৈন্য দুটির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে পানভ আর নিকতিন নিজেদের চৌকির জায়গায় ফিরে এল।

BanglaBook.org

'কিসের জন্য তারা রাত্রে এখানে এসেছে?' প্রশ্ন নিকতিনের।

'মনে হয় খুব দরকার,' বলল পানভ। 'ঠান্ডা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে,' বলে সে তার পশমি আলখাল্লাটার ভাঁজ খুলে গায়ে দিয়ে গাছটার পাশে বসল।

ঘণ্টা দুয়েক পর আভদিয়েভ আর বন্দারেঙ্কো ফিরে এল।

'কী, তাদের বুঝিয়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, কর্নেলের বাড়িতে তারা এখনো ঘুমায়নি। তাদের সোজা তার কাছে নিয়ে গেছে এবং জানো বন্ধুরা, ন্যাড়া ছেলেগুলি বেশ ভালো?' আভদিয়েভ বলে যাচ্ছিল। 'হ্যাঁ, সত্যি? আমি তাদের সঙ্গে কত গল্প করলাম!'

'অবশ্যই, তুমি তো বলবেই,' পাত্তা না দিয়ে বলল নিকতিন।

'আসলেই, তারা ঠিক রুশদের মতো। ওদের একজন বিবাহিত। বাচ্চা আছে দুটো! এত কথা বললাম! ভালো লোক দুটো!'

'আসলেই, ভালো!' বলল নিকতিন। 'তোমাকে একা পেলে তোমার ভুঁড়ি বের করে দিত।'

'একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে,' বলল পানভ।

'হ্যাঁ, তারাগুলো নিভে যাচ্ছে,' আরাম করে বসতে বসতে আভদিয়েভ বলল

এবং সৈন্যরা আবার নীরব হয়ে গেল।

৩

দুর্গে ব্যারাক ও সৈন্যদের বাড়িগুলোর জানালা অনেক আগেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার সবচেয়ে ভালো বাড়িটির জানালাগুলোয় তখনো আলো দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটায় থাকতেন প্রিন্স সাইমন মিখাইলোভিচ ভরন্তসভ, কুরিন রেজিমেন্টের সেনাপতি, রাজকীয় পার্শ্বচর (এডিসি) এবং প্রধান সেনাপতির ছেলে। ভরন্তসভ থাকতেন তার স্ত্রী, পিটার্সবার্গের সুখ্যাত সুন্দরী মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে নিয়ে। ককেশিয়ার ছোট্ট দুর্গে তাদের মতো বিলাসে ওই বাড়িতে আগে আর কেউ থাকেনি। ভরন্তসভের, বিশেষ করে তার স্ত্রীর, মনে হতো তারা অত্যন্ত সাদাসিধে এবং কষ্টকর জীবন যাপন করছে, কিন্তু বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের কাছে তাদের বিলাসিতা ছিল বিস্ময়কর এবং অসাধারণ।

BanglaBook.org

তাদের বিশাল বসার ঘরের জানালায় দামি পর্দা ঝোলানো এবং মেঝে কার্পেটে মোড়া। সেখানে মধ্যরাতেও একটা তাস খেলার টেবিলে চারটি মোমবাতির আলোয় মেজবান এবং মেহমানেরা তাস খেলছিল। খেলোয়াড়দের একজন ছিল ভরন্তসভ নিজে। লম্বাটে চেহারা আর সুন্দর চুলওয়ালা কর্নেল, পোশাকে রাজকীয় পার্শ্বচরের তকমা এবং কাঁধে সোনালি কর্ড। তার সঙ্গী, পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উষ্কখুষ্ক বিষণ্ন চেহারার এক স্নাতক, প্রিন্সেস ভরন্তসভ সম্প্রতি যাকে তার আগের ঘরের ছোট ছেলেটির শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে খেলছিল দুজন সেনা কর্মকর্তা—একজন চওড়া লালমুখো পুরুষ, কোম্পানি কমান্ডার পোলতোরাৎস্কি। দেহরক্ষী দল থেকে বদলি হয়ে এসেছে। অন্যজন সুদর্শন চেহারায় শীতল নির্বিকারভাব ধরে রাখা রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট। সে তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছিল।

প্রিন্সেস মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, স্থূলকায়, বিশালাক্ষী এবং কালো ভুরুধারী সুন্দরী, পোলতোরাৎস্কির পাশে বসে তার তাস দেখছিল, তার ফাঁপানো পোশাক পোলতোরাৎস্কির পা স্পর্শ করছিল। তার কথা, তার দৃষ্টি, তার হাসি, তার সুগন্ধি এবং তার অঙ্গের প্রতিটি নড়াচড়ায় এমন কিছু ছিল, যাতে সংকোচে তার নৈকট্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা ছাড়া পোলতোরাৎস্কি আর সবকিছু ভুলে যাচ্ছিল এবং সে একের পর এক গুরুতর ভুল করায় তার সঙ্গীর ধৈর্যের পরীক্ষা চলছিল।

'নাহ্, এটা খুব খারাপ হলো! তুমি আবার একটা টেক্কা নষ্ট করলে,' পোলতোরাৎস্কি একটা টেক্কা ছুড়ে দিলে মুখ লাল করে রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট বলল।

পোলতোরাৎস্কি কিছু না বুঝে, যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, এমন মুখ করে তার বড় বড় কালো চোখে করুণ দৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ অ্যাডজুট্যান্টের দিকে তাকাল।

'ওকে মাফ করে দাও!' মুচকি হেসে বললেন মারিয়া ভাসিলিয়েভনা। পোলতোরাৎস্কির দিকে ফিরে বললেন, 'দেখেছ, এখন আমি তোমাকে বলেছিলাম না?'

'কিন্তু তুমি মোটেই এটা বলোনি,' হেসে জবাব দিল পোলতোরাৎস্কি।

'তাই নাকি?' মারিয়াও হেসে জবাব দিল এবং তার মুচকি হাসিতে পোলতোরাৎস্কি এতটাই উদ্দীপ্ত আর খুশি হলো যে সে তাসগুলো নিয়ে ফেটাতে শুরু করল।

'এখন তোমার বাটা না,' কড়া গলায় বলল অ্যাডজুট্যান্ট এবং তার সাদা আংটি পরা হাতে তাসগুলো দ্রুত বাটতে শুরু করল, যেন শেষ হলেই সে বাঁচে।

BanglaBook.org

প্রিন্সের খানসামা বসার ঘরে ঢুকে বলল, ডিউটি অফিসার প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'মাফ করো, ভদ্রলোকেরা,' ইংরেজি উচ্চারণে রুশ ভাষায় বললেন প্রিন্স।

'তুমি আমার জায়গাটা নেবে, মারি?'

'তোমরা সবাই রাজি?' জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সেস। তার সিল্কে খসখস শব্দ আর মুখে সুখী মহিলার আভা তুলে মুচকি হেসে দ্রুত সটান দাঁড়িয়ে।

'আমি সব সময় সবকিছুতে রাজি,' প্রিন্সেস, যে খেলার কিছুই জানে না, এখন তার বিপক্ষে খেলবে বলে খুব খুশি হয়ে বলল অ্যাডজুট্যান্ট।

পোলতোরাৎস্কি কেবল হেসে তার তাসগুলো বিছিয়ে দিল।

প্রিন্স যখন বসার ঘরে ফিরে এলেন, দানটি তখন প্রায় শেষ। তিনি ফিরে এলেন উত্তেজিত এবং খুব খুশি মনে।

'তোমরা জানো আমি কী প্রস্তাব করতে যাচ্ছি?'

'কী?'

'চলো, শ্যাম্পেন পান করা যাক।'

'আমি সব সময় তার জন্য প্রস্তুত,' বলল পোলতোরাৎস্কি।

'কেন নয়, খুব মজা হবে!' বলল অ্যাডজুট্যান্ট।

'ভাসিলি! নিয়ে এসো তো!' বললেন প্রিন্স।

'কারা তোমার কাছে এসেছিল?' মারিয়া ভাসিলিয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন।

'ডিউটি অফিসার আর একটা লোক।'

'কে? কী ব্যাপারে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া ভাসিলিয়েভনা।

'আমি কিছুতেই বলতে পারব না,' কাঁধ নেড়ে বললেন ভরন্তসভ।

'আমি কিছুতেই বলতে পারব না,' তার অনুকরণে বললেন মারিয়া ভাসিলিয়েভনা। 'আচ্ছা দেখা যাবে।'

শ্যাম্পেন আনা হলে অতিথিরা প্রত্যেকে এক গ্লাস করে পান করে এবং তাদের খেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় ফলাফল যোগ করে চলে যেতে শুরু করল।

'তোমার কোম্পানিকে কাল বনে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে?' বিদায় নেওয়ার সময় প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন পোলতোরাৎস্কিকে।

'হ্যাঁ, আমার...কেন?'

'ওহ্, তাহলে কাল আবার দেখা হবে,' মৃদু হেসে বললেন প্রিন্স।

'খুব ভালো,' ভরন্তসভ তাকে কী বলছিলেন, তা মোটেও না বুঝে জবাব দিল পোলতোরাৎস্কি, একটু পরই সে মারিয়া ভাসিলিয়েভনার হাতে চাপ দেবে, এই চিন্তাটাই তার মাথায় তখন ঘুরছিল।

মারিয়া ভাসিলিয়েভনা তার অভ্যাসমতো তার (প) হাত শুধু জোরে

BanglaBook.org

চেপেই ধরলেন না, জোরে জোরে ঝাঁকালেন; আবার তাকে রুহিতন তাসটি খেলার ভুলটা মনে করিয়ে দিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে পোলতোরাৎস্কির কাছে তা প্রেমময় ও অর্থপূর্ণ মনে হলো।

পোলতোরাৎস্কি বাসায় ফিরল খুব উৎফুল্ল মনে। কারণটা কেবল তার মতো লোকেরাই বুঝতে পারবে। যারা উচ্চ সমাজে বড় ও শিক্ষিত হয়ে বহু মাস বিচ্ছিন্ন সামরিক জীবন কাটিয়ে তাদের নিজ শ্রেণির একজন মহিলা, তা আবার প্রিন্সেস ভরন্তসভের মতো মহিলার সান্নিধ্য পেয়েছে।

সে এবং তার সহকর্মী যে ছোট বাড়িটায় থাকে, সেখানে পৌঁছে সে দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। সে দরজায় টোকা দিল, কিন্তু তারপরও সেটা খুলল না। সে বিরক্ত হয়ে দরজায় লাথি মারতে ও তলোয়ার দিয়ে ঠক ঠক করতে শুরু করল। তখন সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, পোলতোরাৎস্কির গৃহদাস ভভিলো দরজা আটকানোর খিলটি খুলে দিল।

'নিজেকে তালা দিয়ে কী করছিলি, বলদ?'

'এটা কি সম্ভব, স্যার?'

'আবার মাতাল হয়েছিস! দেখাই তোকে কী করে সম্ভব!' এবং পোলতোরাৎস্কি ভভিলোকে মারতে উদ্যত হয়েও থেমে গেল। 'জাহান্নামে যা! মোমবাতি জ্বালিয়ে আন।'

'এক মিনিট।'

ভভিলো আসলেই মাতাল হয়েছিল। সে রসদ সার্জেন্টের নাম-দিবসের (যে সাধুর নামে নাম রাখা হয়, তার জন্মদিন) পার্টিতে মদ খেয়েছিল। বাড়ি ফিরে সে নিজের জীবনের সঙ্গে সার্জেন্ট ইভান পেত্রোভিচের জীবনের তুলনা করছিল। ইভান পেত্রোভিচ বেতন পায়, বিবাহিত এবং বছরখানেকের মধ্যেই ছাড়া পাওয়ার আশা করছে।

ভভিলো ছেলেমানুষ থাকতেই তাকে তুলে নেওয়া হয়। তার মাকে তাকে তার মালিকের বাড়ির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখন তার বয়স চল্লিশের ওপরে এবং জীবন কাটছে বেপরোয়া মালিকের সঙ্গে সেনাশিবিরে। মনিব হিসেবে সে ভালো, তাকে কদাচিৎ পেটায়; কিন্তু এটা কেমন জীবন? 'আমরা ককেশাস থেকে ফিরে গেলে সে আমাকে মুক্তি দেবে বলেছে, কিন্তু মুক্তি নিয়ে আমি যাব কোথায়? এটা একটা কুত্তার জীবন।' ভভিলো ভাবছিল এবং তার এত ঘুম পেয়েছিল যে কেউ ঘরে ঢুকে কিছু চুরি করতে পারে, এই ভেবে দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পোলতোরাৎস্কি তার শোবার ঘরে ঢুকল, এই ঘরে সে তিখোনভের সঙ্গে থাকে।

BanglaBook.org

'কী, তুমি হেরেছ?' ঘুম ভেঙে তিখোনভ জিজ্ঞেস করল।

'যা হয়, আমি হারিনি। আমি ১৭ রুবল জিতেছি এবং আমরা এক বোতল ক্লিকো (ভোভ ক্লিকো, শ্যাম্পেনের উদ্ভাবক এবং সবচেয়ে পরিচিত শ্যাম্পেন) খেয়েছি!'

'এবং তুমি মারিয়া ভাসিলিয়েভনার দিকে তাকিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি মারিয়া ভাসিলিয়েভনার দিকে তাকিয়েছিলাম,' নকল করে বলল পোলতোরাৎস্কি।

'শিগগিরই ঘুম থেকে ওঠার সময় হবে,' তিখোনভ বলল। 'আমাদের ছয়টার সময় রওনা হতে হবে।'

'ভভিলো!' হাঁকল পোলতোরাৎস্কি, 'দেখ, কাল সকালে আমাকে ঠিক পাঁচটার সময় জাগিয়ে দিবি!'

'আপনার যদি যুদ্ধ করতে হয়, তবে আরেকজন কেন জাগাবে?'

'আমি তোকে বলছি আমাকে জাগাতে! শুনেছিস?'

'ঠিক আছে।' ভভিলো বের হয়ে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল পোলতোরাৎস্কির বুট আর জামাকাপড়। পোলতোরাৎস্কি মুচকি হেসে বিছানায় গেল, একটা সিগারেট টানল এবং মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে সে তার সামনে মারিয়া ভাসিলিয়েভনার হাসিমুখ দেখতে পেল।

ভরন্তসভরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে যায়নি। মেহমানেরা চলে যাওয়ার পর মারিয়া ভাসিলিয়েভনা গেলেন তার স্বামীর কাছে এবং জোর দিয়ে ফরাসিতে বললেন, 'বেশ! এখন আমাকে বলো কী হয়েছিল?'

'কিছু না, আমার বন্ধু।'

'বন্ধু না! একজন দূত এসেছিল, তাই না?'

'যা-ই হোক, আমি তোমাকে তা বলতে পারব না।'

'তুমি বলতে পারবে না? বেশ, আমিই তাহলে তোমাকে বলছি।'

'তুমি?'

'হাজি মুরাদ ছিলেন, তাই না?' ইংরেজিতে বললেন মারিয়া ভাসিলিয়েভনা। তিনি কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার কথা শুনেছিলেন এবং ভেবেছিলেন, হাজি মুরাদ স্বয়ং তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভরন্তসভ তা একদম অস্বীকার করতে পারলেন না। কিন্তু তাকে (ম) এ কথা বলে হতাশ করলেন যে হাজি মুরাদ নিজে ছিলেন না কিন্তু একজন দূত পাঠিয়েছিলেন বলতে যে তিনি আগামীকাল তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। যেখানে তারা গাছ কাটার অভিযানে যাবেন, সেখানে।

BanglaBook.org

তরুণ ভরন্তসভরা, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই, দুর্গের একঘেয়ে জীবনে এই ঘটনায় খুশি হয়েছিলেন এবং এই খবরে তার বাবা কী রকম খুশি হবে, সে নিয়ে কথা বলার পর তারা ঘুমাতে গেলেন। রাত তখন দুটোর বেশি।

৪

তাকে ধরার জন্য শামিলের পাঠানো মুরিদদের এড়াতে তিনটি রাত নির্ঘুম কেটেছে। তাই সাদো শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদ ঘুমিয়ে পড়েন। পুরো পোশাক পরা অবস্থায় হাতের ওপর মাথা রেখে। তার কনুই মেজবানের সাজিয়ে দেওয়া লাল তাকিয়াটির একদম ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।

একটু দূরে দেয়ালের পাশে ঘুমিয়েছিল এলডার। সে শুয়েছিল চিত হয়ে। তার সবল হাত-পা এমনভাবে ছড়ানো, যাতে চাপকানের সামনে সেলাই করে আটকানো কার্তুজের কালো থলেগুলো মাথাটির চেয়ে উঁচু হয়ে ছিল। তার সদ্য কামানো মাথাটা বালিশ থেকে পেছনের দিকে গড়িয়ে পড়েছিল। তাতে নীল আয়নার মতো নিচের কিছুটা অংশও দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরের ঠোঁট বাচ্চাদের ঠোঁটের মতো একবার ফুলে উঠছিল আবার নিচে নামছিল, যেন সে কিছুতে চুমুক দিচ্ছে। হাজি মুরাদের মতো সে-ও পিস্তল এবং ছোরা বেল্টের সঙ্গে গেঁথে রেখেই ঘুমিয়েছিল। আগুনের মালসাটার ঝাঁঝরির ওপর কাঠিগুলো অল্প আঁচে নিবু নিবু। রাতের বাতিটা মিটমিট করছিল দেয়ালের ছোট্ট কোটরে।

রাত আরও গভীর হলে মেহমানদের ঘরের দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল, হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে জেগে পিস্তলের ওপর হাত রেখে উঠে বসলেন। মাটির মেঝেয় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সাদো।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন হাজি মুরাদ, যেন তিনি একদমই ঘুমাননি।

'আমাদের চিন্তার ব্যাপার,' তার সামনে উবু হয়ে বসে বলল সাদো। 'এক মহিলা তাদের ছাদ থেকে আপনাকে আসতে দেখেছে এবং তার স্বামীকে বলে দিয়েছে; এখন গ্রামের সবাই জানে। একজন প্রতিবেশী আমার স্ত্রীকে এইমাত্র বলেছে যে মুরব্বিরা সবাই মসজিদে জমায়েত হয়েছে, তারা আপনাকে আটকাতে চায়।'

'আমাকে তাহলে যেতে হবে!' হাজি মুরাদ বললেন।

BanglaBook.org

'ঘোড়াগুলোয় জিন লাগানো আছে,' বলে কুঁড়ে থেকে দ্রুত বের হয়ে গেল সাদো।

'এলডার!' ফিসফিস করে ডাকলেন হাজি মুরাদ। এলডার তার নাম শুনে, তার চেয়ে বেশি তার মনিবের গলা শুনে, হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার টুপিটা ঠিক করল।

হাজি মুরাদ তার অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে চাদর পরে নিলেন। এলডারও তা-ই করল; তারা দুজনই নিঃশব্দে কুঁড়ে থেকে বারান্দায় বের হয়ে এলেন। কালো চোখের ছেলেটা তাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসেছিল। শক্ত মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে পাশের একটি কুঁড়ের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখল, একটা লোক এবং তার খড়মে খটাশ খটাশ শব্দ তুলে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে মসজিদের দিকে গেল। চাঁদ ছিল না। কিন্তু কালো আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছিল। তাতে অন্ধকারে কুঁড়েঘরগুলোর চালের আকার বোঝা যায়। সব কটি ঘরের চেয়ে উঁচু মিনারসহ মসজিদটি গ্রামের ওপরের দিকটায়। সেখান থেকে মানুষের গুঞ্জন ভেসে আসছিল।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাজি মুরাদ পাদানিতে পা রেখে নিঃশব্দে তার শরীর জিনের উঁচু গদির ওপর তুলে দিলেন।

'আল্লাহ তোমার ভালো করুন,' তার মেজবানকে বললেন। অভ্যাসমতো ডান পাদানিতে পা ঢুকিয়ে যে ছেলেটি ঘোড়া ধরে রেখেছিল, তাকে চাবুক দিয়ে ছুঁয়ে যেতে দেওয়ার ইশারা করলেন। ছেলেটি এক পাশে সরে দাঁড়াল এবং বড় রাস্তার পথ ধরে জোরে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা। যেন ওটার জানাই ছিল কী করতে হবে। এলডার চলছিল তার পিছে। সাদো তার চামড়ার পোশাকে হাত দুলিয়ে সরু পথটা ধরে প্রায় দৌড়ে তাদের পিছু পিছু চলছিল। দুই রাস্তার মোড়ে প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা ছায়া রাস্তার ওপর এসে পড়ে।

'দাঁড়াও। কে? থামো!' চিৎকার করে কেউ বলল এবং কয়েকটা লোক রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

হাজি মুরাদ না থেমে বেল্ট থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে রাস্তা আটকানো লোকগুলোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। লোকগুলো দুপাশে সরে দাঁড়াল। হাজি মুরাদ কোনো দিকে না তাকিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছোটালেন। এলডার তাকে অনুসরণ করল দুলকি কদমে। তাদের দিকে দুটো গুলি ছোড়া হলো, শাঁই শাঁই করে গুলি দুটো তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল হাজি মুরাদ বা এলডারকে আঘাত না করেই। হাজি মুরাদ একই বেগে ছুটতে থাকলেন কিন্তু প্রায় তিন শ গজ যাওয়ার পর সামান্য ঊর্ধ্বশ্বাস নেওয়া ঘোড়াটি থামিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করলেন।

BanglaBook.org

তার সামনে, নিচে, কলকল করে পানির ধারা বয়ে যাচ্ছিল। পেছনের গ্রামটিতে মোরগগুলো ডাকছিল একের পর এক, যেন একটা আরেকটার জবাব দিচ্ছিল। এসব ছাপিয়ে তিনি তার পেছনে এগিয়ে আসা একদল ঘোড়ার ভারী পায়ের আওয়াজ এবং কয়েকটি লোকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন। হাজি মুরাদ তার ঘোড়াটি স্পর্শ করে সমান গতিতে চলতে থাকলেন। তার পেছনের লোকেরা ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে প্রায় ধরে ফেলল। জনা বিশেক ঘোড়সওয়ার, গ্রামটির বাসিন্দা। তারা হাজি মুরাদকে আটকাতে চেয়েছিল, না হলেও অন্তত শামিলকে দেখাতে চেয়েছিল যে তারা হাজি মুরাদকে আটকাতে চেষ্টা করেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাওয়ার মতো কাছে এলে হাজি মুরাদ থামলেন। লাগাম ছেড়ে দিয়ে অভ্যস্ত বাঁ হাত দিয়ে তার রাইফেলের ঢাকনার বোতাম খুললেন। ডান হাত দিয়ে রাইফেলটি তুলে নিলেন। এলডারও তা-ই করল।

'তোমরা কী চাও?' চিৎকার করে বললেন হাজি মুরাদ। 'তোমরা আমাকে ধরতে চাও! তাহলে এসো, ধরো!' এবং তিনি রাইফেল তুললেন। গ্রামের মানুষগুলো থেমে গেল এবং হাজি মুরাদ রাইফেলটি হাতে রেখে উপত্যকায় নামলেন। ঘোড়সওয়ারেরাও তাকে অনুসরণ করল, কিন্তু আরও কাছে গেল না। হাজি মুরাদ উপত্যকার অপর দিকে চলে যাওয়ার পর লোকগুলো চিৎকার করে বলল যে তারা যা বলতে চায়, তার তা শোনা উচিত। জবাবে তিনি রাইফেলের একটা গুলি ছুড়ে জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি একটু কমিয়ে দিলেন। তাকে ধরতে আসা লোকগুলোর কোনো শব্দ, মোরগের ডাকগুলো আর শোনা যাচ্ছে না। বনের ভেতরে পানির নালার কলকল শব্দ আরও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তারপর একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। বনের কালো দেয়াল মনে হলো বেশ কাছেই। এটাই সেই বন মুরিদেরা যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

বনের পাশে পৌঁছে হাজি মুরাদ থামলেন। বুকভরে দম নিয়ে শিস দিয়ে নীরবে অপেক্ষা করলেন কিছু শোনার চেষ্টায়। একটু পর বনের ভেতর থেকে একই রকম শিসের জবাব এল। হাজি মুরাদ রাস্তা থেকে নেমে বনের ভেতরে ঢুকলেন। প্রায় এক শ কদম যাওয়ার পর গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁকে দেখতে পেলেন একটা আগুনের কুণ্ড, তার চারপাশে বসা কিছু লোকের ছায়া এবং আগুনের আধো আলোয় দেখা গেল জিন লাগানো একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। কুণ্ডের পাশে চারজন লোক বসে ছিল।

একজন লোক চট করে দাঁড়াল এবং হাজি মুরাদের কাছে গিয়ে লাগাম ও পাদানি ধরে দাঁড়াল। সে ছিল হাজি মুরাদের ধর্মভাই, তার বাড়ির সবকিছুর দেখাশোনা করত।

BanglaBook.org

'আগুনটা নিভিয়ে দাও,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে হাজি মুরাদ বললেন।

লোকগুলো কুণ্ডটা ভেঙে ছড়িয়ে দিল এবং পোড়া ডালগুলো মাড়াতে শুরু করল।

'বাটা এখানে এসেছিল?' মাটিতে বিছানো একটি চাদরের কাছে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন হাজি মুরাদ।

'হ্যাঁ, সে অনেক আগে খান মাহোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে?'

'ওই দিকে,' হাজি মুরাদ যেদিক দিয়ে এসেছে, তার উল্টো দিক দেখিয়ে জবাব দিল খানেফি।

'ঠিক আছে,' বলে হাজি মুরাদ কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে তাতে গুলি ভরতে শুরু করলেন।

'আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। আমার পেছনে ধাওয়া করেছিল,' আগুন নেভাতে থাকা একটা লোককে বললেন হাজি মুরাদ।

লোকটার নাম গামজালো, চেচেন। গামজালো চাদরটার কাছে গিয়ে সেটার ওপর থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে সেটাকে ঢাকনায় ঢেকে কোনো কথা না বলে বনের ভেতরের খোলা জায়গাটার, যেদিক দিয়ে হাজি মুরাদ এসেছিলেন, সেদিকে চলে গেল।

এলডার ঘোড়া থেকে নেমে হাজি মুরাদ এবং তার ঘোড়াটিকে নিয়ে দুটোর মুখ উঁচু করে দুটো গাছের সঙ্গে লাগাম দিয়ে বেঁধে রাখল। তারপর গামজালোর মতো রাইফেল নিয়ে খোলা জায়গাটার অপর দিকে চলে গেল। আগুনের কুণ্ডটা নেভানো হয়ে গিয়েছিল, বনটাকে আর অত অন্ধকার মনে হচ্ছিল না। আকাশে তারা জ্বলছিল কিন্তু আবছাভাবে।

তারাগুলোর দিকে চোখ তুলে তিনি দেখলেন কৃত্তিকাগুলো (যীশুর বোন নামে পরিচিত নক্ষত্রগুচ্ছ) উঠে মধ্যাকাশে চলে এসেছে। হাজি মুরাদ অনুমান করলেন, মাঝরাত অনেক আগেই পেরিয়েছে এবং এশার নামাজ কাজা হয়ে গেছে। তিনি খানেফিকে একটা বদনা দিতে বললেন (তারা সব সময় তাদের জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা রাখে) এবং চাদর মুড়ি দিয়ে নালাটির দিকে গেলেন।

জুতো খোলার পর অজু করে হাজি মুরাদ আবার চাদরটা গায়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তারপর পুব দিকে ফিরে কানের লতি ছুঁয়ে নামাজ পড়তে শুরু করলেন।

নামাজ শেষ হলে জিনে ঝোলানোর থলিগুলো রাখা জায়গাটার কাছে গিয়ে কনুই দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

BanglaBook.org

নিজের ভাগ্যের ওপর হাজি মুরাদের গভীর বিশ্বাস। কোনো কিছুর পরিকল্পনা করার সময় সাফল্যের দৃঢ় আস্থা তিনি আগাম পেয়ে যেতেন এবং ভাগ্য তার ওপর প্রসন্ন ছিল। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তার সামরিক জীবনের পুরোটাজুড়েই এমন হয়েছে। তাই তিনি আশা করছিলেন এখনো তেমন হবে। তিনি মনে মনে ছবি দেখছেন। তার অধীনে ভরন্তসভের দেওয়া সৈন্যদের নিয়ে তিনি শামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করে প্রতিশোধ নিচ্ছেন এবং রাশিয়ার জার তাকে পুরস্কৃত করছেন। তিনি আবার শুধু আভারিয়া নয়, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা পুরো চেচনিয়া শাসন করবেন। এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, টের পাননি।

তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তার সাহসী অনুসারীরা কী করে গান গাইতে গাইতে এবং 'মুরাদের আগমন...!' ধ্বনি দিতে দিতে শামিলকে ধাওয়া করছে। কী করে শামিল ও তার স্ত্রীদের আটক করছে এবং তিনি শামিলের স্ত্রীদের কান্না ও গোঙানি শুনতে পাচ্ছেন। তার ঘুম ভেঙে গেল। গান ও 'হাজি মুরাদের আগমন!' ধ্বনি এবং শামিলের স্ত্রীদের কান্না হিসেবে যা শুনছিলেন, তা ছিল শিয়ালের ক্রূর হাসি এবং হুক্কা রব, যার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাজি মুরাদ মাথা তুলে তাকালেন আকাশের দিকে। গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তাতে পুব দিকে ইতিমধ্যে আলো দেখা যাচ্ছে। তার একটু দূরে বসে থাকা একজন মুরিদের কাছে খান মাহোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। খান মাহোমা এখনো আসেনি শুনে আবার মাথা নোয়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তার ঘুম ভাঙল বাটার সঙ্গে অভিযান থেকে ফিরে আসা খান মাহোমার উৎফুল্ল গলার আওয়াজে। খান মাহোমা সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদের পাশে বসে পড়ল এবং বলতে লাগল সৈন্যরা তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল এবং কেমন করে খোদ প্রিন্সের কাছে নিয়ে গেল। প্রিন্স কত খুশি হয়েছিল, সকালে তাদের সঙ্গে দেখা করার কী অঙ্গীকার করেছিল, মিচিক থেকে একটু দূরে, শালিন নামের ফাঁকা জায়গাটার কোনখানে রুশেরা গাছ কাটতে যাবে—এই সব। বাটা তার নিজের বর্ণনা দিতে সঙ্গী দূতকে মাঝেমধ্যে থামিয়ে দিচ্ছিল।

হাজি মুরাদ বিশেষ করে জানতে চাচ্ছিলেন তার রুশদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবের জবাবে ভরন্তসভ ঠিক কী বলেছে। খান মাহোমা আর বাটা একই কথা বলল যে প্রিন্স হাজি মুরাদকে মেহমান হিসেবে বরণ করার এবং তার জন্য ভালো হবে, এমন কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন।

তারপর হাজি মুরাদ তাদের রাস্তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। খান মাহোমা রাস্তাটা ভালো চেনে এবং তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করল।

BanglaBook.org

শুনে হাজি মুরাদ কিছু টাকা নিয়ে বাটাকে দিলেন এবং তার আগের কথামতো তিনটি রুবলও দিলেন। তারপর তার মুরিদদের জিনের থলে থেকে সোনায় মোড়া অস্ত্র ও পাগড়ি বের করে সেগুলো পরিষ্কার করতে বললেন, যাতে রুশদের সামনে গেলে তাদের ভালো দেখায়।

তারা যখন অস্ত্র, লাগাম ও ঘোড়াগুলো পরিষ্কার করছিল, আকাশের তারারা তখন ডুবে গিয়েছে। আলো বেশ ফুটে উঠেছে এবং সকালের মন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে।

৫

খুব সকালে অন্ধকার থাকতে থাকতেই পোলতোরাৎস্কির অধীনে দুটো কোম্পানি শাহগিরনস্কি ফটক দিয়ে বের হয়ে কুচকাওয়াজ করে ছয় মাইল পার হয়ে এল। এক সারি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী বসিয়ে দিনের আলো ফোটামাত্র তারা গাছ কাটতে শুরু করল। আটটার দিকে আগুনের কুণ্ডলীতে হিসহিস পটপট করে ফুটতে থাকে ভেজা কাঁচা ডালগুলো। ওগুলো থেকে ওঠা সুগন্ধি ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কুয়াশা। গাছ কাটিয়েরা এতক্ষণ পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিল না; শুধু একজন আরেকজনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। এখন তারা আগুনের কুণ্ড এবং কাটা গাছে বন্ধ বনের রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছিল। কুয়াশার মধ্যে সূর্যকে একবার উজ্জ্বল একটা ফোঁটার মতো দেখাচ্ছিল, আবার তা চলে যাচ্ছিল।

রাস্তা থেকে একটু দূরে বনের ফাঁকা জায়গাটায় তৃতীয় কোম্পানির দুই অফিসার পোলতোরাৎস্কি এবং তার অধস্তন তিখোনভ এবং মারামারি করার জন্য পদাবনতি পাওয়া অশ্বারোহী গার্ড বাহিনীর সাবেক অফিসার ব্যারন ফ্রিজ ঢাকগুলোর ওপর বসে ছিল। ফ্রিজ ছিল ক্যাডেট কলেজে পোলতোরাৎস্কির সহপাঠী। খাবার মোড়ানো কাগজের টুকরা, সিগারেটের গোড়া এবং কিছু খালি বোতল ঢাকগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। অফিসাররা আগে ভোদকা পান করেছে, এখন চলছিল খাওয়া আর পোর্টার বিয়ার পান। একজন ঢাকবাদক তাদের তৃতীয় দফায় বোতলের ছিপি খুলে দিচ্ছিল।

পোলতোরাৎস্কি রাতে যথেষ্ট ঘুমাতে পারেনি। কিন্তু বিপদের আশঙ্কার মধ্যে এবং অধীন সৈন্য ও সহকর্মীদের সঙ্গে থাকলে সে বিশেষ উল্লাস ও বেখেয়ালি আনন্দ অনুভব করে। সে তখনো ঠিক তেমন বোধ করছিল।

BanglaBook.org

অফিসাররা কথাবার্তা বলছিল প্রফুল্ল মনে, তার বিষয় ছিল পাওয়া সর্বশেষ খবর: জেনারেল স্লেপ্তসভের মৃত্যু। তাদের কেউ এই মৃত্যুকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের সমাপ্তি এবং যেখানে উৎপত্তি, সেখানেই ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত হিসেবে দেখছিল না। বরং তারা এটাকে কেবল একজন সাহসী যোদ্ধার বীরত্ব হিসেবে দেখছিল, যে তলোয়ার হাতে নিয়ে পাহাড়িদের দিকে ছুটে গিয়ে তাদের কচুকাটা করছিল।

তাদের সবাই যদিও জানত, বিশেষ করে যারা যুদ্ধ করেছে এবং না জেনে উপায় ছিল না যে তখনকার দিনে ককেশাসে কখনো, সত্যি বলতে কি, কোনোখানেই কখনো মুখোমুখি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা হয় না। কারণ, সব সময় মনে করা হয় এবং বলা হয় যে তলোয়ার বা বেয়নেট দিয়ে শুধু পালাতে থাকা যোদ্ধাদের কোপানো যায়। মুখোমুখি যুদ্ধের সেই গল্পে পাওয়া অহংকার ও উৎফুল্লতা নিয়ে তারা ঢাকের ওপর বসে (কেউ হালকা মেজাজে, অন্যরা তার উল্টো খুব বিনয়ীভাবে) পান আর হাসিঠাট্টা করছিল। যে মৃত্যু স্লেপ্তসভকে নিয়ে গেছে, তেমনি তাদেরও যেকোনো সময় নিয়ে যেতে পারে, এই দুশ্চিন্তা তাদের ছিল না এবং তাদের কথার মাঝখানে, যেন তাদের আশঙ্কার প্রমাণ হিসেবে তারা রাস্তার বাঁ দিকে রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পেল। একটা বুলেট শিসস শব্দ করে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাদের কাটিয়ে গিয়ে একটা গাছে লাগল।

'হো হো!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল পোলতোরাৎস্কি, 'এটা তো আমাদের লাইনেই এসেছে...কস্টিয়া,' তারপর ফ্রিজের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ভাগ্য ভালো। কোম্পানির কাছে ফিরে যাও। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধে নামব, খুব মজা হবে। আমরা দেখিয়ে দেব।'

ফ্রিজ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ধোঁয়ায় ঢাকা জায়গাটার দিকে কোম্পানির কাছে চলে গেল।

পোলতোরাৎস্কির কালো লেজ ও কেশরওয়ালা তামাটে রঙের ছোট কাবার্ডা ঘোড়াটাকে তার কাছে আনা হলো। সে ওটায় চড়ে গিয়ে কোম্পানিকে নিয়ে যেদিক থেকে গুলি এসেছিল, সেদিকে রওনা হলো। পাহারাচৌকি বসানো হয়েছিল বনের কিনার ঘেঁষে, খাদের খোলা ঢালের পাশে। বাতাস বইছিল বনের দিকে, শুধু খাদের ঢালটাই না, অপর দিকটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পোলতোরাৎস্কি সীমার কাছে পৌঁছালে কুয়াশার পেছন থেকে সূর্য বের হয়ে এল এবং গিরিখাদের অন্য পারে একটা নতুন বনের কিনারে, প্রায় সিকি মাইল দূরে, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার চোখে পড়ল। তারা ছিল হাজি মুরাদকে ধাওয়া করা চেচেন এবং তারা দেখতে চাচ্ছিল যে হাজি মুরাদ রুশদের সঙ্গে দেখা করেছে। তাদের একজন সৈন্যদলের দিকে গুলি ছুড়ল। কয়েকজন সৈন্য পাল্টা

BanglaBook.org

গুলি ছুড়ল। চেচেনরা পিছু হটে গেলে গোলাগুলি বন্ধ হলো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পোলতোরাৎস্কি কোম্পানি নিয়ে হাজির হয়ে গুলি চালানোর আদেশ দিল। তার আদেশ মুখ দিয়ে বের হতে না-হতেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীদের সারি থেকে সবাই আনন্দে-উত্তেজনায় রাইফেলের খটাখট শব্দে সুন্দর করে মিলিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে অবিরাম গুলি চালাতে শুরু করল। একঘেয়েমি কাটানোর কিছু পেয়ে খুশি সৈন্যরা, দ্রুত রাইফেল ভরে একের পর এক গুলি চালায়। চেচেনরাও উত্তেজনায় একের পর এক লাফিয়ে সামনে এসে সৈন্যদের দিকে কিছু গুলি চালায়। তার একটা গুলিতে একজন সৈন্য আহত হয়। এ হলো সেই আভদিয়েভ, যে আগের রাতে ওত পাতার জায়গায় শুয়ে ছিল। সহযোদ্ধারা তার কাছে এসে দেখে সে উপুড় হয়ে দুহাতে আহত পেট চেপে ধরে মাথা নিচু করে পড়ে আছে এবং এদিক-ওদিক দুলছে আর আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে। সে পোলতোরাৎস্কির কোম্পানির। পোলতোরাৎস্কি কয়েকজন সৈন্যকে জড়ো হতে দেখে তাদের কাছে গেল।

'কী হয়েছে, বাবা? গুলি লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল পোলতোরাৎস্কি। 'কোথায়?'

আভদিয়েভ জবাব দিল না।

'স্যার, আমি গুলি ভরতে যাচ্ছিলাম, তখন খট করে শব্দ শুনি,' আভদিয়েভের পাশে থাকা একজন সৈন্য বলল। 'আমি তাকিয়ে দেখলাম সে বন্দুক ফেলে দিয়েছে।'

'টুক টুক টুক!' জিব দিয়ে আওয়াজ করল পোলতোরাৎস্কি। 'খুব ব্যথা লাগছে, আভদিয়েভ?'

'খুব ব্যথা না, কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না। স্যার, এক ফোঁটা ভোদকা!'

একটু ভোদকা (বা ককেশাসে সৈন্যরা যে মদ পান করে) আনা হলো এবং পানভ গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকে বোতলের মুখ ভর্তি করে আভদিয়েভকে দিল। আভদিয়েভ পান করার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

'আমার পেট উগরে আসছে,' সে বলল। 'তুমি খেয়ে ফেলো।'

পানভ মদটুকু পান করল।

আভদিয়েভ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবার পড়ে গেল। তারা একটা চাদর বিছিয়ে তাতে আভদিয়েভকে শুইয়ে দিল।

'স্যার, কর্নেল সাহেব আসছেন,' পোলতোরাৎস্কিকে জানাল সার্জেন্ট-মেজর।

'ঠিক আছে, তোমরা একে দেখো?' বলে পোলতোরাৎস্কি চাবুক মেরে জোরে দুলকি চালে ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

BanglaBook.org

ভরন্তসভ তার উন্নত জাতের বিলাতি বাদামি রঙের খোজা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, তার সঙ্গে ছিল একজন কসাক অ্যাডজুট্যান্ট এবং একজন চেচেন দোভাষী।

'এখানে কী হয়েছে?' ভরন্তসভ জিজ্ঞেস করলেন।

'একদল চেচেন আমাদের বাইরের লাইনে আক্রমণ করেছিল,' পোলতোরাৎস্কি জবাব দিল।

'রাখো, রাখো; তুমি নিজেই এগুলো সাজিয়েছ!'

'না না, প্রিন্স, আমি না,' একটু হেসে বলল পোলতোরাৎস্কি, 'তারা নিজেরাই এগিয়ে গেছে।'

'শুনলাম একজন সৈন্য আহত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, দুঃখজনক, সে খুব ভালো সৈন্য।'

'গুরুতর?'

'গুরুতর, মনে হয় পেটে লেগেছে।'

'তুমি জানো আমি কোথায় যাচ্ছি?' ভরন্তসভ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি জানি না।'

'আন্দাজ করতে পারো?'

'না।'

'হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে, আমরা এখন তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'গতকাল তার দূত এসেছিল আমার কাছে,' তার আনন্দের হাসি কষ্ট করে চেপে রেখে বললেন ভরন্তসভ। কয়েক মিনিটের মধ্যে শালিন ফাঁকা জায়গাটায় সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। খোলা জায়গাটা পর্যন্ত লক্ষ্যভেদীদের বসিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে এসো।'

'বুঝতে পারছি,' বলে টুপি ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে পোলতোরাৎস্কি চলে গেল তার কোম্পানির কাছে। পাকা লক্ষ্যভেদীদের ডান দিকে বসানোর জন্য নিজে তাদের নিয়ে গেল আর সার্জেন্ট-মেজরকে বাঁ দিকের পাঁরি বসিয়ে দিতে বলল।

কয়েকজন সৈন্য ইতিমধ্যে আহত আভদিয়েভকে দুর্গে নিয়ে যায়।

ভরন্তসভের কাছে ফেরার পথে পোলতোরাৎস্কি দেখতে পেল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার তার পিছু পিছু এসে তাকে পার হয়ে যাচ্ছে। সামনে সাদা কেশরের একটি ঘোড়ায় যাচ্ছে জমকালো পোশাকে একজন লোক। তার মাথায় পাগড়ি এবং অস্ত্রগুলোয় সোনা দিয়ে কাজ করা। এই লোকটি হাজি মুরাদ। তিনি পোলতোরাৎস্কির কাছে এসে তাতার ভাষায় কিছু বললেন। ভুরু কুঁচকে, হাত নেড়ে ও মুচকি হেসে পোলতোরাৎস্কি ইশারা করল সে বুঝতে

BanglaBook.org

পারেনি। তার স্মিত হাসির জবাবে হাজি মুরাদও স্মিত হাসি হাসলেন এবং সেই শিশুসুলভ হাসিতেই পোলতোরাৎস্কি গলে গেল। পোলতোরাৎস্কি কখনো কল্পনা করেনি পাহাড়িদের ত্রাস সৃষ্টিকারী নেতাটি দেখতে এমন হবে। ভেবেছিল সে দেখতে রুক্ষ এবং শক্তপোক্ত গড়নের হবে; আর তার সামনে এই প্রাণময় লোকটি, তার হাসি এত সরল যে পোলতোরাৎস্কির মনে হয়েছে কতকালের চেনা। তার অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রশস্ত চোখ দুটো কালো ভুরুর নিচ থেকে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিয়ে শান্ত অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায়।

হাজি মুরাদের দলে ছিল পাঁচজন। তাদের একজন খান মাহোমা, গত রাতে যে প্রিন্স ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গোলাপি আভার গায়ের রং, গোল মুখ এবং পাপড়িহীন চোখে প্রফুল্ল দৃষ্টি, যেন জীবনের আনন্দে পূর্ণ। আর ছিল আভার খানেফি, রোমশ মোটাসোটা মানুষ, জোড়া ভুরু। হাজি মুরাদের সব সম্পত্তির দায়িত্ব ছিল তার ওপর, সে একটা খোজা ঘোড়ায় জিনের সঙ্গে লাগানো বস্তাবোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে আসছিল। দলের দুজন লোক ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমজন দাগেস্তানের পাহাড়ি এলাকার এক তরুণ, চওড়া কাঁধ, কিন্তু কোমর মেয়েদের মতো সরু, মুখে বাদামি দাড়ি কেবল গজাতে শুরু করেছে, চোখ ভেড়ার চোখের মতো সুন্দর। এ হলো এলডার। অন্যজন গামজালো, একজন চেচেন, এক চোখ কানা, ভুরু বা পাপড়ি নেই, ছোট লাল দাড়ি এবং তার মুখ ও নাকের ওপর আড়াআড়ি কাটা দাগ। পোলতোরাৎস্কি হাজি মুরাদকে দেখাল ভরন্তসভ রাস্তায় উঠে এসেছেন। ঘোড়া চালিয়ে হাজি মুরাদ তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তার ডান হাত বুকের ওপর রেখে তাতার ভাষায় কিছু বলে থামলেন। চেচেন দোভাষী তা বুঝিয়ে দিল।

সে বলছে, 'আমি রুশ জারের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমি তার সেবা করতে চাই,' সে বলছে, 'আমি অনেক আগে থেকেই তা করতে চেয়েছি কিন্তু শামিল করতে দেয়নি।'

দোভাষীর কথা শুনে ভরন্তসভ তার শ্যাময় চামড়ার দস্তানায় ভরা হাত হাজি মুরাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হাজি মুরাদ ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে পরক্ষণে তা দৃঢ়ভাবে চাপ দিয়ে ধরলেন, আবার কিছু বললেন প্রথমে দোভাষীর দিকে তাকিয়ে, তারপর তাকালেন ভরন্তসভের দিকে।

'তিনি বলছেন, আপনাকে ছাড়া আর কারও কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে চাননি। কারণ, আপনি একজন সরদারের ছেলে এবং তিনি আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।'

ভরন্তসভ ধন্যবাদ জানানোর জন্য মাথা নাড়লেন। হাজি মুরাদ তার দলের দিকে দেখিয়ে আবার কিছু বললেন।

BanglaBook.org

'তিনি বলছেন, এই লোকগুলো তার বিশ্বাসী সমর্থক এবং তার মতো এরাও রুশদের জন্য কাজ করতে চায়।'

ভরন্তসভ তাদের দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন। প্রফুল্ল, পাপড়িহীন কালো চোখ, চেচেন খান মাহোমাও মাথা নাড়ল এবং এমন কিছু বলল যা হয়তো মজার ছিল, রোমশ আভার ঠোঁট মুচকি হাসল, যাতে তার হাতির দাঁতের মতো চকচকে দাঁত বের হয়ে এল। কিন্তু লালচুলো গামজালোর একমাত্র লাল চোখটি ভরন্তসভের দিকে একনজর দিয়েই তার ঘোড়ার কানের দিকে স্থির হয়ে গেল।

ভরন্তসভ ও হাজি মুরাদ তাদের দলবল নিয়ে দুর্গে ফিরে যাওয়ার পর সৈন্যরা কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিজেদের মন্তব্য বলাবলি করছিল।

'এই শয়তানটা কতগুলো লোক মেরেছে! এখন দেখো তাকে নিয়ে এরা কী অযথা হইচই করে!'

'স্বাভাবিক, সে ছিল শামিলের ডান হাত, আর এখন কোনো ভয় নেই!'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না সে একজন চমৎকার লোক। একজন পাকা জিগিত (ককেশীয় অঞ্চলের দক্ষ ঘোড়সওয়ার)।

'আর ওই লালটা? লালটা মানুষের দিকে জানোয়ারের মতো পিটপিট করে তাকায়!'

'হুম্, ওইটা নিশ্চয়ই শিকারি কুত্তা!'

তারা সবাই লাল লোকটাকে বিশেষভাবে লক্ষ করেছে। গাছ কাটার জায়গায় রাস্তার সবচেয়ে কাছের সৈন্যরা দৌড়ে দেখতে এসেছিল। তাদের অফিসার আগতদের ধমক দিয়েছিল কিন্তু ভরন্তসভ তাকে থামিয়ে দেন।

'তাদের পুরোনো বন্ধুদের একবার দেখতে দাও।'

'তুমি জানো লোকটা কে?' সবচেয়ে কাছের সৈন্যটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে তার ইংরেজি উচ্চারণে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন ভরন্তসভ।

'না, জনাব।'

'হাজি মুরাদ—তার নাম শুনেছ?'

'আমরা না জানি কী করে, জনাব? আমরা বহুবার তাকে হারিয়েছি!'

'হ্যাঁ, আমরাও তার কাছ থেকে মার খেয়েছি।'

'ঠিক বলেছেন, জনাব,' তাদের অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে পারায় খুশি হয়ে সৈন্যটি জবাব দিল।

হাজি মুরাদ বুঝতে পারলেন তারা তার সম্বন্ধেই কথা বলছে, তিনি তার উজ্জ্বল চোখে হাসলেন।

দারুণ উৎফুল্ল মনে ভরন্তসভ দুর্গে ফিরে এলেন।

BanglaBook.org

তরুণ ভরন্তসভ খুব খোশমেজাজে ছিলেন। কারণ, আর কেউ নয়, স্বয়ং তিনি রাশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং সক্রিয় শত্রু শামিলের পরের লোকটিকে জয় করতে এবং ঘরে আনতে সফল হয়েছেন। শুধু একটা জিনিস খচখচ করছিল, ভজভিঝেনস্কে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেলার-জাকোমেলস্কি। আসলে পুরো ঘটনাটাই তার মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল। ভরন্তসভ কোনো খবর না দিয়ে নিজেই পুরো কাজটি করায় অপ্রিয় কিছু হতে পারে। এই চিন্তা তার প্রফুল্লতায় কাঁটার মতো খচখচ করছিল। দুর্গে পৌঁছে তিনি হাজি মুরাদের সহকারীদের দায়িত্ব রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্টের হাতে দিয়ে নিজে হাজি মুরাদকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

অভিজাত পোশাক পরা প্রিন্সেস মারিয়া ভাসিলিয়েভনা তার ছয় বছর বয়সী কোঁকড়া চুলের সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে বসার ঘরে হাজি মুরাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হাজি মুরাদ হাত বুকের ওপর রেখে, তার সঙ্গে ঘরে আসা দোভাষীর মাধ্যমে অতি বিনয়ে বললেন, প্রিন্স তাকে বাড়িতে নিয়ে আসায় তিনি নিজেকে প্রিন্সের বন্ধু বলে মনে করেন এবং একজন বন্ধুর পরিবারের সবাই তার কাছে বন্ধুর মতোই পবিত্র।

হাজি মুরাদের চেহারা ও ব্যবহারে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা খুশি হলেন এবং নিজের বড় সাদা হাতটি বাড়িয়ে দেওয়ায় তার রক্তিমাভ হয়ে যাওয়াতেও হাজি মুরাদের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন মারিয়া। তাঁকে বসার জন্য বলে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কফি পান করবেন। কফি পরিবেশন করা হলো। কিন্তু পরিবেশনের পর হাজি মুরাদ তা খেলেন না। হাজি মুরাদ রুশ ভাষা একটু একটু বুঝতেন কিন্তু বলতে পারতেন না। রুশ ভাষার কথা কিছু বুঝতে না পারলে তিনি হাসেন এবং তার হাসিতে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা খুশি হলেন, যেমন তা খুশি করেছিল পোলতোরাৎস্ককেও। কোঁকড়া চুল উৎসুক চোখের ছোট ছেলেটি (তার মা যাকে বুল্কা নামে ডাকে) মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাজি মুরাদের ওপর থেকে চোখ একটুও সরায়নি, বড় যোদ্ধা হিসেবে যার সুনাম সে শুনেছে।

স্ত্রীর কাছে হাজি মুরাদকে রেখে, তার রাশিয়ার পক্ষে চলে আসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন লিখতে ভরন্তসভ তার অফিসে গেলেন। প্রতিবেদন লেখা শেষে গ্রজনিতে লেফট ফ্ল্যাঙ্কের অধিনায়ক-জেনারেল, জেনারেল কজলভস্কি এবং তার বাবার কাছে চিঠি লেখা শেষ হওয়ার পর ভরন্তসভ জলদি বাড়িতে রওনা হলেন, মনে ভয়, একজন ভয়াবহ অপরিচিত লোকের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তার স্ত্রী হয়তো তেতে থাকবে। তার ওপর

BanglaBook.org

লোকটির সঙ্গে এমন আচরণ করতে হবে, যাতে সে ক্ষুব্ধ না হয় আবার বেশি বিনয়ীও না হয়। কিন্তু তার শঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। হাজি মুরাদ ভরন্তসভের সৎছেলে ছোট্ট বুল্কাকে হাঁটুর ওপর নিয়ে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ছিলেন; আর মাথা নিচু করে দোভাষীর মাধ্যমে হাস্যোচ্ছল মারিয়া ভাসিলিয়েভনার কথা শুনছিলেন। মারিয়া ভাসিলিয়েভনা বলছিলেন কোনো বন্ধু ভরন্তসভের কোনো কিছুর প্রশংসা করলে ভরন্তসভ তা উপহার হিসেবে দিয়ে দেন, অবস্থা এমন যে, তাকে শিগগিরই এডামের মতো জিনিস খুঁজতে নামতে হবে।

বলতে বলতে প্রিন্স ঘরে ঢুকলেন। বুল্কাকে অবাক ও অসন্তুষ্ট করে হাঁটু থেকে নামিয়ে দিয়ে হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখের হালকাভাব কঠিন ও গম্ভীর হয়ে যায় এবং ভরন্তসভ বসার পরই কেবল তিনি আবার বসেন।

আলাপের খেই ধরে হাজি মুরাদ মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে জবাব দেন যে তাদের সমাজেও বন্ধু কোনো কিছুর প্রশংসা করলে তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নিয়ম।

'আপনার ছেলে!' ছোট ছেলেটির কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি আবার তার হাঁটুতে উঠে বসেছিল।

'তোমার দস্যু খুব মজার!' মারিয়া ভাসিলিয়েভনা তার স্বামীকে ফরাসিতে বলল। 'বুল্কা তার ছোরাটা পছন্দ করেছে আর উনি সেটা ওকে দিয়ে দিয়েছেন।'

বুল্কা তার বাবাকে ছোরাটা দেখাল।

'এটা তো খুব দামি জিনিস!' তার মা বলল।

'আমাদেরও কোনো সুযোগে তাকে উপহার দিতে হবে,' ভরন্তসভের জবাব।

হাজি মুরাদ চোখ বন্ধ করে ছেলেটির কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বলছিলেন, 'জিগিত, জিগিত!' (তাতার ভাষায় অর্থ দক্ষ সাহসী ঘোড়সওয়ার)।

'সুন্দর, খুব সুন্দর ছোরা,' ছোরাটার ধারালো ফলা খাপ থেকে অর্ধেক বের করে রুশ ভাষায় বললেন ভরন্তসভ। ফলাটার মাঝখানে একটা শিরা। 'আপনাকে ধন্যবাদ!'

দোভাষীকে বললেন, 'জিজ্ঞেস করো আমি তার জন্য কী করতে পারি।'

দোভাষী তার অর্থ বললে হাজি মুরাদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তার কিছু দরকার নেই, শুধু নামাজ পড়ার জায়গা দেখিয়ে দিলেই হবে।

ভরন্তসভ খানসামাকে ডেকে হাজি মুরাদ যা চেয়েছে, তা-ই করতে বললেন।

BanglaBook.org

তাকে দেওয়া কামরায় ঢুকে একা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজি মুরাদের চেহারা পাল্টে গেল। কখনো বিনয়ী, কখনো গুরুগম্ভীর এবং প্রসন্নতার ছাপ উবে গিয়ে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। হাজি মুরাদ যা ভেবেছিলেন, ভরন্তসভ তাকে তার চেয়ে ভালোভাবে বরণ করেছেন। কিন্তু ভরন্তসভ ও তার কর্মকর্তারা যত ভালো ব্যবহার করছিল হাজি মুরাদ তাদের তত কম বিশ্বাস করছিলেন। সবকিছুতেই তার শঙ্কা, তাকে গ্রেপ্তার করে শিকল বেঁধে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে বা খুন করা হতে পারে এবং তাই সে হুঁশিয়ার ছিল। এলডার তার ঘরে ঢুকলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন অন্য মুরিদদের কোথায় রাখা হয়েছে, তাদের অস্ত্র নিয়ে নিয়েছে কি না, ঘোড়াগুলোই-বা কোথায়। এলডার খবর দিল ঘোড়াগুলো প্রিন্সের আস্তাবলে রাখা হয়েছে, মুরিদদের একটা খামার ঘরে রাখা হয়েছে, তবে অস্ত্রগুলো তাদের কাছেই আছে, একজন দোভাষী খাবার এবং চা দিচ্ছে।

হাজি মুরাদ সন্দেহে মাথা নাড়লেন। কাপড় ছেড়ে নামাজ পড়লেন এবং এলডারকে তার রুপার ছুরিটা এনে দিতে বললেন। তারপর পোশাক পরে বেল্ট বেঁধে সোফার ওপর পা তুলে বসে ভাগ্যে কী আছে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন।

বিকেল চারটায় দোভাষী তাকে প্রিন্সের সঙ্গে খানা খেতে ডেকে নিয়ে গেল।

রাতের খাবারে তিনি প্রায় কিছুই খেলেন না, শুধু মারিয়া ভাসিলিয়েভনা নিজে থালার যে দিকটা থেকে পোলাও নিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিক থেকে একটু পোলাও নিলেন।

'সে ভয় করছে আমরা তাকে বিষ খাওয়াব,' স্বামীর দিকে মন্তব্য মারিয়া ভাসিলিয়েভনার। 'আমি যে-ই দিক থেকে নিয়েছি, সে-ও ঠিক সেই দিক থেকে নিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীর মাধ্যমে হাজি মুরাদকে জিজ্ঞেস করল তিনি আবার কখন নামাজ পড়বেন। হাজি মুরাদ পাঁচটা আঙুল তুলে সূর্যের দিকে ইশারা করে দেখালেন। 'তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সময় হয়ে যাবে,' ভরন্তসভ তার ঘড়ি বের করলে একটা স্প্রিংয়ে চাপ দিলেন। ঘড়িতে সোয়া চারটার ঘণ্টা বাজল। বোঝা গেল, হাজি মুরাদ ওটায় খুব অবাক হয়েছেন, তিনি ঘণ্টাটা আবার শোনার এবং ঘড়িটা দেখতে দেওয়ার অনুরোধ করলেন।

প্রিন্সেস তার স্বামীকে ফরাসিতে বলল, 'এটাই সুযোগ! তাকে ঘড়িটা দিয়ে দাও।'

ভরন্তসভ সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা হাজি মুরাদকে দিয়ে দিলেন।

তিনি বুকে হাত রাখলেন এবং ঘড়িটা নিলেন। কয়েকবার স্প্রিংটায় চাপ দিয়ে ঘণ্টার আওয়াজটা শুনলেন এবং প্রশংসা করে মাথা নাড়লেন।

BanglaBook.org

খাওয়া শেষ হলে কেউ একজন জানাল, মেলার-জাকোমেলস্কির এডিসি এসেছে।

এডিসি প্রিন্সকে জানাল হাজি মুরাদের আসার খবর পেয়ে জেনারেল খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ, তাকে এ বিষয়ে আগে জানানো হয়নি এবং হাজি মুরাদকে কোনো দেরি না করে তার কাছে পাঠাতে বলেছেন। ভরন্তসভ জেনারেলের আদেশ মানার কথা বললেন এবং দোভাষীর মাধ্যমে হাজি মুরাদকে এই আদেশের কথা জানিয়ে তাকে মেলারের কাছে যেতে বললেন।

এডিসি কী জন্য এসেছে, শুনে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা তক্ষুনি বুঝতে পারলেন তার স্বামী ও জেনারেলের মধ্যে এটা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে, তাই তার স্বামীর কোনো বারণ না শুনে সে এডিসি ও হাজি মুরাদের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

(ফরাসিতে তাদের দুজনের আলাপ।)

'তুমি বাড়িতে থাকলেই বেশি ভালো হবে। এটা আমার ব্যাপার, তোমার নয়।'

'জেনারেলের বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে তুমি আমাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না!'

(রুশ ভাষায় তাদের দুজনের কথা।)

'তুমি অন্য সময় যেয়ো।'

'আমি এখনই যেতে চাই!'

কিছুতেই ঠেকাতে না পেরে রাজি হলেন ভরন্তসভ; শেষ পর্যন্ত তারা তিনজনই গেলেন।

তারা ঘরে ঢুকলে মেলার গম্ভীর অথচ ভদ্রভাবে মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং এডিসিকে বললেন হাজি মুরাদকে অপেক্ষা করার ঘরে বসাতে এবং আবার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে যেন বাইরে যেতে না দেয়।

তার পড়ার ঘরের দরজা খুলে প্রিন্স ভরন্তসভকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করলেন এবং প্রিন্সকে তার আগে যেতে দিলেন।

পড়ার ঘরে ঢুকে তিনি প্রিন্সের সামনে থেমে তাকে বসতে না দিয়েই বললেন, 'এখানে আমি অধিনায়ক, তাই শত্রুর সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা অবশ্যই আমার মাধ্যমে করতে হবে! তুমি কেন আমাকে হাজি মুরাদের আসার কথা জানাওনি?'

'একজন দূত এসে আমাকে বলেছিল, হাজি মুরাদ কেবল আমার কাছে ধরা দিতে চায়,' উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে রাগত জেনারেলের কাছ থেকে রূঢ় জবাব আসবে ভেবে নিজেও রেগে জবাব দিলেন ভরন্তসভ।

BanglaBook.org

'আমি জিজ্ঞেস করছি আমাকে কেন জানানো হয়নি?'

'আমি তা করতে চেয়েছিলাম, ব্যারন, কিন্তু...

'তুমি আমাকে ব্যারন বলবে না, স্যার বলবে!' সেই মুহূর্তে 'ব্যারনে'র রাগ হঠাৎ ফেটে পড়ল এবং দীর্ঘদিন ধরে তার মনে যত রাগ জমা হয়ে ফুটছিল, তা সব বের হতে থাকল।

'আমি সাতাশ বছর জারের চাকরি এই জন্য করিনি যে পরিবারের সুপারিশে গতকাল চাকরিতে যোগ দিয়ে কেউ আমার নাকের নিচে এমন সব আদেশ দিতে থাকবে, যেগুলো তাদের কোনো কাজ নয়!'

বাধা দিয়ে ভরন্তসভ বললেন, 'স্যার, আমি আপনাকে অসত্য কিছু না বলার অনুরোধ করছি।'

'আমি সত্য কথাই বলছি, আমি সহ্য করব না... জেনারেল আরও রেগে বললেন।

সেই মুহূর্তে স্কার্টে খসখস শব্দ তুলে মারিয়া ভাসিলিয়েভনা ঘরে ঢুকল, তার পেছনে পেছনে একজন ছোটখাটো ভদ্র মহিলা, মেলার-জাকোমেলস্কির স্ত্রী।

'শোনো, শোনো ব্যারন! সাইমন তোমাকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি,' মারিয়া ভাসিলিয়েভনা বলতে শুরু করলেন।

'আমি সে কথা বলছি না, প্রিন্সেস...

'ঠিক আছে, এগুলো সব বাদ দাও! তুমি জানো, "খারাপ শান্তি ভালো ঝগড়ার চেয়ে ভালো!"...হায় খোদা, আমি কী বলছি?' এবং সে হাসতে শুরু করল।

ক্রুদ্ধ জেনারেল সুন্দরীর হাসিতে ধরা পড়লেন। তার গোঁফের নিচে ভেসে উঠল মুচকি হাসি।

'স্বীকার করি আমি ভুল করেছি,' বললেন ভরন্তসভ, 'কিন্তু...

'আমিও একটু খেপে গিয়েছিলাম,' বললেন মেলার এবং প্রিন্সের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ঠিক হলো হাজি মুরাদকে তখনকার মতো মেলারের কাছেই রাখা হবে এবং পরে তাকে লেফট-ফ্ল্যাঙ্কের অধিনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হাজি মুরাদ বসে ছিলেন পাশের ঘরে এবং কী বলা হচ্ছিল, বুঝতে না পারলেও যা বোঝা দরকার, তা ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন। যেমন ঝগড়া হচ্ছিল তাকে নিয়েই এবং তার শামিলকে ছেড়ে আসাটা রুশদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই তারা তাকে মারবে না বা নির্বাসনে পাঠাবে না, বরং সে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নিতে পারবে। তিনি আরও

BanglaBook.org

বুঝেছিলেন, মেলার-জাকোমেলস্কি অধিনায়ক হলেও অধীনস্থ ভরন্তসভের মতো প্রভাব তার নেই। ভরন্তসভ গুরুত্বপূর্ণ আর মেলার-জাকোমেলস্কি গুরুত্বহীন এবং তাই মেলার-জাকোমেলস্কি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে হাজি মুরাদ দৃপ্ত ও জমকালো ভাষায় বললেন, তিনি শ্বেতাঙ্গ জারের সেবা করতে এসেছেন এবং কেবল তার সরদারের কাছেই জবাব দেবেন। তার সরদার বলতে তিনি তিবলিসে প্রধান সেনাপতি প্রিন্স ভরন্তসভকেই বুঝিয়েছিলেন।

৭

আহত আভদিয়েভকে হাসপাতালে নিয়ে সাধারণ ওয়ার্ডে একটা খালি বিছানা দেওয়া হলো। হাসপাতালটা দুর্গে ঢোকার পথে একটা কাঠের বাড়ি, ছাদটাও তক্তা দিয়ে বানানো। ওয়ার্ডে চারজন রোগী—একজনের টাইফাস, তার প্রচণ্ড জ্বর। আরেকজন দেখতে ফ্যাকাশে এবং চোখের নিচে কালি। তার ম্যালেরিয়ার মতো পালা জ্বর। সে অবিরাম গোঙাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আবার জ্বর আসবে। বাকি দুজন তিন সপ্তাহ আগের এক হামলায় আহত। একজনের হাতে লেগেছিল, সে দাঁড়িয়েছিল। অন্যজনের লেগেছিল কাঁধে। সে ছিল বিছানায় বসা। টাইফাসের রোগীটা ছাড়া সবাই কাছে গিয়ে আভদিয়েভ এবং যারা তাকে নিয়ে এসেছিল, তাদের ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'কোনো কোনো সময় তারা এত গুলি করে যে মনে হবে তোমার ওপর মটরশুঁটি ছিটাচ্ছে, কিন্তু তাতেও কিছুই হয় না আর এবারমাত্র গোটা পাঁচেক গুলি করেছে,' যারা নিয়ে এসছিল, তাদের একজন বলল।

'ভাগ্যে যা আছে, প্রত্যেকের তা হবে!'

'আহ্!' বিছানায় নামানোর সময় ব্যথা সহ্য করার চেষ্টায় জোরে ককিয়ে উঠল আভদিয়েভ। নামানো হলে সে কোঁকানি থামাল এবং ভুরু কুঁচকে তার পা অনবরত নাড়াচ্ছিল। তার ক্ষতের ওপর হাত রেখে সে সোজা সামনে তাকিয়ে থাকল।

ডাক্তার এসে তাকে উপুড় করে শোয়াতে বলল, যাতে দেখতে পারে গুলি পেছন দিয়ে বের হয়ে গেছে কি না।

'এটা কী?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করল। রোগীর পিঠ থেকে পাছা পর্যন্ত দুটো লম্বা সাদা দাগ, কাটা চিহ্নের মতো একটা আরেকটার ওপর দিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

'এটা অনেক আগে হয়েছিল, স্যার!' ককিয়ে জবাব দিল আভদিয়েভ।

আভদিয়েভ মদের পেছনে সব টাকা উড়িয়ে দেওয়ায় যে চাবুক খেয়েছিল, তারই দাগ ওগুলো। ডাক্তার অনেকক্ষণ তার পেটে পরীক্ষা করে গুলিটি পেল কিন্তু বের করতে পারল না। সে ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ বেঁধে প্লাস্টার করে দিয়ে চলে গেল। ডাক্তারের পরীক্ষা ও ব্যান্ডেজ বাঁধার পুরো সময়টা আভদিয়েভ দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে ছিল। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর সে চোখ খুলে অবাক হয়ে চারদিক দেখল। সে অন্য রোগীদের এবং শল্যবিদের আরদালির দিকে তাকাল শূন্য দৃষ্টিতে, কিন্তু অন্য কী একটা তাকে অবাক করে দিল।

তার বন্ধু পানভ ও সেরোগিন এসেছে। কিন্তু আভদিয়েভ শুয়ে থাকল একইভাবে, সামনের দিকে তাকিয়ে। তার বন্ধুদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকার অনেকক্ষণ পর সে সহকর্মীদের চিনতে পারল।

'পিটার, তোমার বাড়িতে কি খবর দেওয়া দরকার?' পানভ জিজ্ঞেস করল।

আভদিয়েভ পানভের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও জবাব দিল না।

'তোমার বাড়িতে কি কিছু বলে পাঠাতে হবে?' আভদিয়েভের মোটা হাড়ের ঠান্ডা হাত ছুঁয়ে আবার জিজ্ঞেস করল পানভ।

আভদিয়েভের যেন হুঁশ ফিরে এল।

'ও! পানভ!'

'হ্যাঁ, দেখো, আমি এসেছি! তোমার বাড়িতে খবর পাঠাতে হবে না? সেরোগিন একটা চিঠি লিখে দেবে।'

'সেরোগিন... কষ্ট করে সেরোগিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে আভদিয়েভ বলল, 'তুমি কি লিখে দেবে?...তাহলে লিখো, "তোমার ছেলে পিটার তোমাদের অনেক দিন বেঁচে থাকতে বলেছে (প্রচলিত এই কথার অর্থ চিঠির লেখক মারা গেছে)। সে তার ভাইকে হিংসা করে"...আমি আজকেই তোমাদের এ কথা বলেছি..."সে এখন খুশি হবে। তাকে বিরক্ত কোরো না। তাকে বাঁচতে দাও। ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখুক। আমি খুশি!" এই লিখে দাও।'

এ কথা বলে পানভের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তোমার পাইপটা পেয়েছ?' পানভ জবাব দিল না।

'তোমার পাইপ...তোমার পাইপ! জিজ্ঞেস করছি ওটা পেয়েছ?' আভদিয়েভ আবার বলল।

'ওটা আমার ব্যাগে ছিল।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে!...বেশ, এখন আমাকে একটা মোমবাতি এনে দাও...আমি মরতে যাচ্ছি,' বলল আভদিয়েভ।

ঠিক তখনই পোলতোরাৎস্কি তার সৈন্যকে দেখার জন্য ভেতরে ঢুকল।

'কেমন আছ, ব্যাটা! খারাপ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না,' আভদিয়েভ চোখ বুজে মাথা নেড়ে জানাল। তার চোয়াল মোটা মুখটা ছিল ফ্যাকাশে আর কঠোর। সে জবাব দিল না কিন্তু আবার পানভকে বলল, 'একটা মোমবাতি আনো...আমি মারা যাচ্ছি।'

একটা মোমবাতি এনে তার হাতে দেওয়া হলো কিন্তু তার আঙুলগুলো বাঁকানো যাচ্ছে না বলে বাতিটাকে আঙুলের মধ্যেই গুঁজে দিয়ে তার জন্য উঁচু করে ধরা হলো।

পোলতোরাৎস্কি চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পর আরদালি আভদিয়েভের হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করল বুকে কান পেতে, বলল, সব শেষ।

আভদিয়েভের মৃত্যুর বিবরণ যেভাবে তিবলিসে পাঠানো হয়, তা নিচে দেওয়া হলো।

'২৩ নভ। কুরিন রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি দুর্গ থেকে বের হয়ে গাছ কাটার অভিযানে যায়। দুপুরের দিকে অনেক পাহাড়ি গাছ কাটিয়েদের ওপর হঠাৎ হামলা করে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীরা পিছু হটতে শুরু করে কিন্তু দ্বিতীয় কোম্পানি বেয়নেট দিয়ে আক্রমণ করে পাহাড়িদের হটিয়ে দেয়। এই ঘটনায় দুজন সৈন্য সামান্য আহত হয় এবং একজন নিহত হয়। পাহাড়িদের প্রায় ১০০ জন হতাহত হয়েছে।'

৮

ভজভিঝেনস্কের হাসপাতালে পিটার আভদিয়েভ মারা যাওয়ার দিন তার বৃদ্ধ বাবা, যে ভাইয়ের বদলে সে সামরিক বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তার স্ত্রী এবং সেই ভাইয়ের মেয়ে শক্ত বরফশীতল মাড়াইয়ের জায়গায় যব মাড়াই করছিল। ভাইয়ের মেয়েটা ঋতুমতী এবং বিয়ের যোগ্য হয়েছে।

তার আগের দিন ভারী তুষার পড়েছে এবং সকালের দিকে তা জমে বরফ হয়ে যায়। মোরগগুলো তৃতীয়বার ডাকলে বুড়ো জেগে যায় এবং বরফঢাকা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো দেখে চুলার ওপর থেকে নেমে আসে, তার বুট, ভেড়ার চামড়ার গরম কাপড় এবং টুপি পরে বের হয়ে মাড়াইয়ের

BanglaBook.org

জায়গায় যায়। ঘণ্টা দুয়েক সেখানে কাজ করার পর সে কুঁড়ের মধ্যে ফিরে এসে তার ছেলে ও মহিলাদের জাগায়। ছেলের বউ ও মেয়েটা মাড়াইয়ের জায়গায় গিয়ে দেখে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করা এবং একটা কাঠের কোদালে সাদা শুকনা বরফে আটকে আছে, তার পাশে কাঠির ঝাঁটাগুলোর শলা ওপরের দিক করে দাঁড়ানো। দুই সারি যবের আঁটি শিষগুলো মুখোমুখি করে পরিষ্কার করা মাড়াইয়ের জায়গাজুড়ে রাখা। তারা তাদের মাড়াইয়ের লাঠি বেছে নিয়ে তিনজন তালে তালে মাড়াই শুরু করে দিল। বুড়ো তার ভারী লাঠিটি দিয়ে খড়গুলো ভেঙে ফেলছিল; মেয়েটা শিষগুলোকে মাপা হাতে পেটাচ্ছিল আর ছেলের বউ তার লাঠি দিয়ে যবগুলো উল্টে দিচ্ছিল।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছিল এবং তারা তাদের সারি প্রায় শেষ করে আনার সময় মাড়াইকারীদের সঙ্গে যোগ দিল বুড়োর বড় ছেলে আকিম।

তাকে দেখে কাজ থামিয়ে বুড়ো তার মাড়াইয়ের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই অলসের মতো কী করছিলি?'

'ঘোড়াগুলোকেও দেখতে হয়েছে।'

'ঘোড়াগুলো দেখতে হয়েছে!' ছেলেকে ভেঙিয়ে বলল বাবা। 'ওগুলো বুড়ি দেখবে। তোর মাড়াইয়ের লাঠি নে! ভোটকা হয়েছিস, ব্যাটা মাতাল!'

'তুমি আমাকে মদ দিয়েছিলে?' বিড়বিড় করে বলল ছেলে।

'কী?' একটা বাড়ি বন্ধ করে কড়া দৃষ্টিতে বলল বুড়ো।

ছেলে নীরবে একটা লাঠি তুলে নিলে তারা চারটা লাঠি দিয়ে মাড়ানো শুরু করল।

'ত্রাক, টপটম...ত্রাক, টপটম ত্রাক...' বুড়োর ভারী লাঠির বাড়ি পড়ছে বাকি তিনজনের ওপরে।

'তোর গর্দান এ রকম ভদ্রলোকের মতো হয়েছে কেন! এই দেখ, আমার ট্রাউজার ঝুলে থাকার জন্য কিছু কোমরে কিছু নেই!' বাড়ি না দিয়ে শুধু তাল রাখার জন্য শূন্যে লাঠিটা ঘুরিয়ে বলল বুড়ো।

তাদের সারি শেষ হয়ে গেলে মেয়েরা আঁচড়া দিয়ে খড়গুলো সরাতে শুরু করল।

'তোর বদলে পিটার গিয়ে বোকামি করেছে। সেনাবাহিনী তোর বলদামি ছুটিয়ে দিত; বাড়িতে সে তোর পাঁচটার সমান হতো!'

'অনেক হয়েছে, বাবা,' আঁটি বাঁধার খড়গুলো সরাতে সরাতে বলল ছেলের বউ।

'হ্যাঁ, তোমাদের ছয়টাকে খাওয়াই আর একজনের কাজও পাই না! পিটার দুজনের সমান কাজ করত। সে এ রকম ছিল না।'

BanglaBook.org

পায়ে চলা পথ ধরে বাড়ি থেকে এল বুড়োর স্ত্রী। তার শক্ত করে পশমি ফিতে জড়ানো পায়ে নতুন গাছের বাকলের জুতা। তার নিচে জমাট বরফ মচমচ করে ভাঙছিল। পুরুষেরা কাঠের কোদাল দিয়ে আঝাড়া যবগুলো এক জায়গায় জড়ো করছিল। যেগুলো পড়েছিল, ছেলের বউ আর মেয়ে তা ঝাড়ু দিচ্ছিল।

'গ্রামের মুরব্বিদের পাঠিয়েছিল, সবাইকে ইট টানতে মালিকের বাড়িতে যেতে বলেছে,' বুড়ি বলল। 'আমি নাশতা বানিয়ে রেখেছি...তোমরা খেতে আসবে না?'

'ঠিক আছে। যা, পাতলা গদিটা লাগিয়ে যা।' আকিমকে বলল বুড়ো, 'দেখিস, আমাকে আবার সেদিনের মতো বিপদে ফেলিস না! পিটারের জন্য দুঃখ না করে পারা যায় না!'

'সে যখন বাড়িতে ছিল, তখন তুমি তাকে বকাবকি করতে,' পাল্টা জবাব দিল আকিম। 'এখন সে নাই আর তুমি আমার সঙ্গে ঘ্যান ঘ্যান করো।'

'এতেই বোঝা যায় এটা তোর পাওনা,' তার মা একই রকম রাগত সুরে বলল। 'তুই কখনো পিটারের সমান হবি না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' ছেলে বলল।

'ঠিক আছে, আসলেই! গম বেচে মদ গিলেছ, এখন তুমি বলছ 'ঠিক আছে!'

'যা গেছে যেতে দিন না!' ছেলের বউ বলল।

বাবা ও ছেলের এই ঝগড়া বহুদিনের, প্রায় পিটার সেনাবাহিনীতে যাওয়ার পর থেকে। তখন থেকেই বুড়ো মনে করত সে নাকের বদলে নরুন পেয়েছে। বুড়ো বুঝত একজন পিতার চেয়ে একজন সন্তানহীনের যাওয়াই ঠিক। আকিমের চার সন্তান ছিল, পিটারের একজনও না; কিন্তু পিটার তার বাবার মতো দক্ষ, বিচক্ষণ, সবল, ধৈর্যবান এবং সর্বোপরি পরিশ্রমী ছিল। সে সব সময় কাজ করত। কোথাও যাওয়ার সময় সে যদি দেখত লোকে কাজ করছে, তবে সে থেমে তাদের সাহায্য করত, যেমন তার বাবাও করত, হয় দু-এক বোঝা খড় কেটে দিত বা গাড়ি বোঝাই করে দিত বা গাছ কেটে দিত বা কাঠ ফেড়ে দিত। সে চলে যাওয়ায় বুড়ো খুব দুঃখ করত, কিন্তু তার কোনো প্রতিকার ছিল না। সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নাম লেখানো তখনকার দিনে মরে যাওয়ার মতো ছিল। একজন সৈন্য যেন গাছের কাটা ডাল; বাড়িতে তার জন্য দুঃখ করা ছিল কারও বুক অকারণে ছিঁড়ে ফেলার মতো। শুধু মাঝেমধ্যে বড় ছেলেকে খোঁচানোর জন্য বাবা এই কথা বলত, সেদিন সে যেমন বলেছিল। কিন্তু তার মা প্রায়ই ছোট ছেলের কথা মনে করত এবং সে অনেক দিন ধরে, প্রায় এক বছর ধরে তার স্বামীকে বলছিল পিটারকে কিছু টাকা

BanglaBook.org

পাঠাতে, বুড়ো তার কোনো জবাব দেয়নি।

আভদিয়েভদের পরিবার সচ্ছল ছিল এবং বুড়ো কিছু টাকা গোপনে জমিয়ে রেখেছিল কিন্তু সে কিছুতেই সরিয়ে রাখা টাকায় হাত দিত না। এখন সে ছোট ছেলের কথা বলছে শুনে তার বুড়ি স্ত্রী ঠিক করল, তাকে যব বেচে অন্তত এক রুবল পাঠানোর কথা আবার বলবে। সে তা-ই করল। অন্যরা মালিকের কাজ করার জন্য চলে যাওয়ার পরই তারা একা হয়ে গেলে, সে বুড়োকে যব বেচা টাকা থেকে পিটারকে এক রুবল পাঠাতে রাজি করাল।

তাই তিনটি টানা গাড়িতে ছিয়ানব্বই বুশেল (এক বুশেল=আট গ্যালন) বস্তার ঘেরে কাঠের আংটা দিয়ে সাবধানে বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হলে বুড়ি বুড়োর হাতে একটা চিঠি দিল। গির্জার কেরানি বুড়ির কথামতো লিখে দিয়েছে। বুড়ো কথা দিল, শহরে গিয়ে সে এক রুবল ভরে সঠিক ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

বুড়ো ভেড়ার চামড়ার একটি নতুন কাপড় পরে তার ওপর বাড়িতে বানানো চাদর পরল এবং পায়ে সাদা পশমি ফিতে পেঁচাল, চিঠিটি নিয়ে তার ছোট ব্যাগে ভরল, তারপর দোয়া পড়ে সামনের গাড়িটিতে উঠে শহরে রওনা হলো। তার নাতি বসল পেছনের গাড়িটায়। শহরে পৌঁছে সে সরাইয়ের লোকটাকে চিঠিটা দিল তাকে পড়ে শোনানোর জন্য। সে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং তাতে সায় দিল।

চিঠিতে পিটারের মা প্রথমে তাকে দোয়া করেছিল, তারপর সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং তার দাদার মৃত্যুর খবর লেখা ছিল এবং তারপর লেখা ছিল আকসিনিয়া (পিটারের স্ত্রী) তাদের সঙ্গে থাকতে চায়নি, সে চাকরি করছে এবং তারা শুনেছে যে সে সুন্দর, সৎ জীবন কাটাচ্ছে। তারপর রুবল পাঠানোর কথা। সবশেষে তার নিজের কথাগুলো। সে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে যা বলেছে, গির্জার কেরানি ঠিক সেই শব্দগুলোই হুবহু লিখে দিয়েছে—

'আরেকটা কথা, আমার প্রিয় বাছা, আমার মিষ্টি পায়রা, আমার নিজের পিটারকিন! আমি তোমার কথা মনে করে সব সময় চোখের পানি ফেলি, আমার চোখের আলো। তুমি আমাকে কোথায় রেখে গেছ?' এই সময় বুড়ি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'এতেই চলবে!' চিঠিতে শব্দগুলো ঠিক এইভাবে ছিল। কিন্তু ভাগ্যে লেখা ছিল না যে পিটার তার স্ত্রীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বা রুবল পাঠানোর কথা বা মায়ের শেষ কথাগুলো জানতে পারবে। চিঠিটা পাঠানো টাকাসহ ফেরত আসে এবং জানানো হয় পিটার তার জারকে, তার পিতৃভূমিকে এবং অর্থোডক্স ধর্মমতকে রক্ষার যুদ্ধে মারা গেছে। সেনাবাহিনীর কেরানি এভাবেই লিখেছিল।

BanglaBook.org

এই খবর পৌছানোর পর বুড়ি যতক্ষণ সময় করতে পারল কাঁদল, তারপর কাজে লেগে গেল। ঠিক পরের রোববার সে গির্জায় গিয়ে একটি প্রার্থনাসংগীত গাইল এবং যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাদের নাম উচ্চারণের জায়গায় সে পিটারের নাম বলল; তারপর সে ঈশ্বরের ভৃত্য পিটারের নামে সব ভালো মানুষের মধ্যে পবিত্র রুটি বিতরণ করল।

পিটারের বিধবা আকসিনিয়া মাত্র এক বছর একসঙ্গে থাকা প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে হাউমাউ করে বিলাপ করল। স্বামীর জন্য এবং তার নিজের ছারখার হয়ে যাওয়া জীবনের জন্য দুঃখ করল; বিলাপের মধ্যে সে পিটারের কোঁকড়া কালো চুল এবং তার ভালোবাসার কথা, ছোট্ট এতিম আইভানকে নিয়ে তার দুঃখময় জীবনের কথা মনে করছিল; অচেনা পৃথিবীতে ঠেলে দেওয়া হতভাগ্য বউটির দিকে না দেখিয়ে ভাইয়ের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য পিটারকে বকল!

আকসিনিয়া অবশ্য মনে মনে স্বামীর মৃত্যুতে খুশি হয়েছিল। সে যে দোকানে কাজ করত, তার মালিকের মাধ্যমে সে আবার গর্ভবতী হয়েছিল; এখন কেউ আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না, দোকানমালিক তাকে বিয়েও করতে পারে, তাকে পটানোর জন্য দোকানমালিকটি তা-ই বলেছিল।

৯

মিখাইল সেমিয়ানোভিচ ভরন্তসভ রুশ রাষ্ট্রদূতের ছেলে হওয়ায় ইংল্যান্ডে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার সমসাময়িক উচ্চপদস্থ রুশ কর্মকর্তাদের থেকে ব্যতিক্রমী ইউরোপীয় শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভদ্র, অধস্তনদের প্রতি দয়ালু এবং উচ্চপদস্থদের অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী ছিলেন। ক্ষমতা ও বশ্যতা ছাড়া জীবন কী, তা তিনি জানতেন না। সব পদ ও পুরস্কার পেয়েছিলেন, ক্রাসনির যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করায় তাকে একজন মেধাবী অধিনায়ক মনে করা হতো।

১৮৫১ সালে তার বয়স ছিল সত্তরের বেশি কিন্তু তিনি বেশ সতেজ, চটপটে ছিলেন, তার ওপর সাবলীল, পরিশীলিত ও অমায়িক বিচারবুদ্ধি পুরোপুরি ধরে রেখেছিলেন। এসব গুণ তিনি ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য কাজে লাগাতেন। তার ধন-সম্পদ ছিল প্রচুর, তার নিজের এবং তার স্ত্রীর (জন্মের পর তার নাম ছিল কাউন্টেস ব্রানিত্স্কি), এবং ভাইসরয় হিসেবে

BanglaBook.org

পেতেন বিশাল অঙ্কের বেতন। তিনি সম্পদের একটা বড় অংশ ক্রাইমিয়ার দক্ষিণ কূলে একটা প্রাসাদ এবং বাগান বানাতে খরচ করেন।

৭ ডিসেম্বর ১৮৫১ সাল। সন্ধ্যায় তিবলিসে তার প্রাসাদের সামনে একটা তিন ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। ধুলায় ধূসর ক্লান্ত একজন কর্মকর্তা গাড়ি থেকে নেমে পায়ের জমে যাওয়া পেশিগুলো টান করে সান্ত্রিদের পার হয়ে চওড়া গাড়িবারান্দায় ঢুকল। জেনারেল কজলভস্কি তাকে হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন। তখন সন্ধ্যা ছয়টা এবং ভরন্তসভ রাতের খাবারের জন্য যাচ্ছিলেন, সে সময় তাকে দূত আসার খবর দেওয়া হয়। ভরন্তসভ তার সঙ্গে দেখা করেন আর তাই ডিনারে যেতে কয়েক মিনিট দেরি হয়।

তিনি যখন বসার ঘরে ঢুকলেন, আমন্ত্রিত ৩০ জন অতিথির কেউ কেউ প্রিন্সেস এলিজাবেথ কাসাভিয়েরেভনা ভরন্তসভের পাশে বসে ছিলেন বা ছোট ছোট দলে জানালাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। তারা সবাই প্রিন্সের দিকে তাকালেন। ভরন্তসভ পড়েছিলেন নিয়মিত ব্যবহারের কালো সামরিক কোট, তবে কাঁধে পদমর্যাদার বিহ্ন ছিল না। গলায় ছিল সর্বোচ্চ সামরিক পদক অর্ডার অব সেন্ট জর্জের হোয়াইট ক্রস।

পরিষ্কার করে কামানো লম্বাটে মুখে স্মিত হাসি ধরে তিনি ভুরু কুঁচকে অতিথিদের একবার দেখলেন। দ্রুত হালকা পায়ে ঢুকে দেরি করার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন মহিলাদের কাছে, পুরুষদের স্বাগত জানালেন। তারপর লম্বা, আনুমানিক ৪৫, প্রাচ্য ধাঁচের সুন্দরী প্রিন্সেস মানানা ওরবেলিয়ানির দিকে এগিয়ে গিয়ে বাহু বাড়িয়ে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করলেন। প্রিন্সেস কাসাভিয়েরেভনা ভরন্তসভ তার বাহু বাড়িয়ে দিলেন তিবলিস ভ্রমণে আসা একজন লালচুল খোঁচা-গোঁফ জেনারেলের দিকে। একজন জর্জীয় প্রিন্স তার বাহু বাড়ালেন প্রিন্সেস ভরন্তসভের বান্ধবী কাউন্টেস শোয়ালোইয়ের দিকে; এডিসি ড. আন্দ্রিয়েভস্কি এবং অন্যরা মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে বা একাই সামনের যুগলদের অনুসরণ করলেন। উর্দি এবং হাঁটু অব্দি আঁটো পায়জামা পরা খানসামারা চেয়ার পিছে টেনে এবং আবার সামনে ঠেলে দিয়ে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করে দিল। প্রধান খানসামা রুপার পাত্র থেকে বড় হাতা দিয়ে নম্রভাবে পেয়ালায় স্যুপ ঢেলে দিল।

লম্বা টেবিলের ঠিক মাঝখানে ভরন্তসভ বসে ছিলেন, তার স্ত্রী বসে ছিলেন উল্টো দিকে, জেনারেলকে ডান দিকে নিয়ে। প্রিন্সের ডান দিকে বসে ছিলেন সুন্দরী ওরবেলিয়ানি; আর বাঁ দিকে ছিলেন কালোচুল, গোলাপি চাঁপার মতো রঙের কমনীয় এক জর্জীয় মহিলা। ঝকমকে অলংকারের মধ্য থেকে তিনি হেসেই চলছিলেন।

BanglaBook.org

বার্তাবাহক কী খবর নিয়ে এসেছে, তার স্ত্রীর প্রশ্নে ফরাসিতে জবাব দিলেন ভরন্তসভ, 'চমৎকার, প্রিয়তমা।' 'সিমোনের সৌভাগ্য!' তিনি জোরে বলতে শুরু করলেন, যাতে সবাই শুনতে পায়। দারুণ খবর (যদিও তার জন্য অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ, অনেক দিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল) যে শামিলের সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী এবং বিখ্যাত হাজি মুরাদ রুশদের পক্ষে চলে এসেছেন, দু-এক দিনের মধ্যেই তাকে তিবলিসে আনা হবে।

টেবিলের শেষ দিকে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প ও হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত তরুণ এডিসি, অফিসাররাসহ প্রত্যেকে চুপ করে শুনতে লাগল।

'জেনারেল, আপনি কি কখনো হাজি মুরাদকে দেখেছেন!' প্রিন্সের কথা শেষ হলে প্রিন্সেস তার পাশে বসা গাজরবর্ণ গুঁফো জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন।

'একাধিকবার, প্রিন্সেস।'

এবং জেনারেল বলতে শুরু করলেন, ১৮৪৩ সালে পাহাড়িরা গার্গবিল দখল করে নিলে হাজি মুরাদ জেনারেল পাসেকের বাহিনীর ওপর হামলা করেন এবং প্রায় তাদের চোখের সামনেই কর্নেল জোলোতুখিনকে হত্যা করেন।

তার কথা শুনে জেনারেল আলোচনায় যোগ দেওয়ায় খুশি হয়ে ভরন্তসভ বিনয়ীভাবে মুচকি হাসলেন। কিন্তু হঠাৎ ভরন্তসভের চেহারায় অমনোযোগ ও বিষাদের ছাপ পড়ল।

জেনারেল না থেমে বলতে থাকলেন হাজি মুরাদের সঙ্গে তার দ্বিতীয় সাক্ষাতের কথা।

'কেন, আপনার কি মনে নেই, এ হচ্ছে সেই লোক, যে 'বিস্কিট' অভিযানে 'উদ্ধার দলের' ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়েছিল।'

জেনারেল যে 'উদ্ধার দলের' কথা বলছিলেন, সেটা ছিল দারগো অভিযানের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, যখন সেনাপতি ভরন্তসভসহ সব সৈন্য অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত যদি সৈন্য বৃদ্ধি করে তাদের উদ্ধার করা না হতো। সবাই জানত ভরন্তসভের অধীনে দারগো অভিযান একটি লজ্জাজনক ঘটনা। কারণ, রাশিয়া তাতে হেরে যায়, অনেক নিহত ও আহত হয় এবং বেশ কিছু কামান খোয়াতে হয়। তাই কেউ ভরন্তসভের উপস্থিতিতে ওই ঘটনার উল্লেখ করলে ভরন্তসভ জারের কাছে সেটাকে রুশ সেনাবাহিনীর চমৎকার সাফল্য উল্লেখ করে যেভাবে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, সেটাই বলেন। কিন্তু 'উদ্ধার' শব্দটি সোজাসুজি বুঝিয়ে দেয় যে ঘটনাটা চমৎকার বিজয় ছিল না, বরং বহু জীবননাশী মারাত্মক ভুল ছিল। সবাই তা বুঝেছিল, তাই কেউ কেউ জেনারেলের কথার অর্থ না বোঝার ভান করল, অন্যরা ঘাবড়ে গিয়ে এরপর

BanglaBook.org

কী ঘটে দেখার অপেক্ষায় ছিল, কেউ কেউ ইশারা বিনিময় করে মিটিমিটি হাসছিল। কেবল গাজরবর্ণ গুঁফো জেনারেল কিছুই বুঝতে পারছিলেন না এবং তার বর্ণনা চালিয়ে যেতে থাকলেন, 'উদ্ধার অভিযানে, মহাত্মন।'

তার প্রিয় বিষয়টি শুরু করতে পেরে জেনারেল প্রতিমুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে চললেন হাজি মুরাদ কী করে ধূর্তভাবে রুশ সেনাদলকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেন, যাতে 'উদ্ধার দল' (মনে হচ্ছিল 'উদ্ধার' শব্দটি তার খুব প্রিয়) না গেলে রুশ বাহিনীর একটা লোকও পালাতে পারত না, কারণ...জেনারেল তার কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ, কী ঘটছে বুঝতে পেরে মানান ওরবেলিয়ানি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তিবলিসে থাকার ভালো জায়গা পেয়েছেন কি না। বিস্মিত হয়ে জেনারেল চারদিকে সবার দিকে তাকালেন এবং দেখলেন টেবিলের শেষ প্রান্তে তার এডিসি তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে স্থির তাকিয়ে আছে। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন। প্রিন্সেসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি ভুঁরু কুঁচকে থেমে গেলেন। তারপর তার প্লেটে যেসব সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়েছিল, তা না চিবিয়েই গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন। খাবারগুলোর স্বাদ-গন্ধ-রূপ সব তার কাছে রহস্যময় লাগল।

সবাই অস্বস্তিবোধ করছিল, সেই অবস্থা কাটিয়ে দিলেন জর্জীয় প্রিন্স—একটা বেকুব কিন্তু চতুর তোষামুদে। তিনি বসে ছিলেন প্রিন্সেস ভরন্তসভের অন্য পাশে। কী ঘটছে, তা যেন বুঝতে পারেননি, এমনভাবে তিনি বলতে শুরু করলেন হাজি মুরাদ কেমন করে মেহকুলের আহমেদ খানের বিধবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'সে রাতে গ্রামে এসে যা নিতে চেয়েছিল, নিয়ে পুরো দলসহ ফিরে যায়।'

'কেন সে এই বিশেষ মহিলাকে নিয়েছিল?' প্রিন্সেস জিজ্ঞেস করলেন।

'ওহ্, সে মহিলার স্বামীর শত্রু ছিল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার পেছনে ধাওয়া করে ধরতে পারেনি, তাই তার স্ত্রীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল।'

প্রিন্সেস জর্জীয় প্রিন্সের পাশে বসা তার পুরোনো বান্ধবী কাউন্টেস শোয়াসোইকে কথাগুলো ফরাসিতে বুঝিয়ে দিলেন।

'কী ভয়ানক!' কাউন্টেস ফরাসিতে বললেন।

'ওহ্, না!' মৃদু হেসে বললেন ভরন্তসভ। 'আমি শুনেছি সে বীরের মতোই তার বন্দীকে সম্মান করেছিল এবং পরে মুক্তি দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মুক্তিপণের বিনিময়ে!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু একই কথা, সে সম্মানজনক ব্যবহার করেছিল।'

প্রিন্সের কথাগুলো আলোচনার খেই ধরিয়ে দিয়েছিল। আমন্ত্রিতরা বুঝতে পেরেছিলেন, হাজি মুরাদকে যত গুরুত্ব দেওয়া হবে, প্রিন্স ততই খুশি হবেন।

'লোকটির অবাধ্যতা মুগ্ধকর। একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ!'

BanglaBook.org

'কেন, ১৮৪৯ সালে সে তেমির-খান-শুরায় প্রকাশ্য দিনের বেলা যে তাণ্ডব চালিয়েছিল।'

তখন তেমির-খান-শুরায় উপস্থিত ছিলেন, টেবিলের শেষ দিকে বসা এমন একজন আর্মেনীয় হাজি মুরাদের সেই লুটের কথা বিস্তারিত বললেন।

আসলে খাওয়ার সময়ের পুরোটা জুড়েই হাজি মুরাদের কথা আলোচনা হচ্ছিল।

প্রত্যেকে একের পর এক হাজি মুরাদের সাহস, যোগ্যতা ও মহানুভবতার কথা বলছিলেন। কেউ একজন তার ২৬ জন বন্দীকে জবাইয়ের আদেশ দেওয়ার কথা বললেন; কিন্তু স্বভাবতই সেটারও বিরোধিতা হলো।

'কী করা যেত? যুদ্ধ যুদ্ধই (ফরাসি প্রবাদ)!'

'সে মহান লোক।'

'যদি ইউরোপে তার জন্ম হতো, তাহলে সে হয়তো আরেকজন নেপোলিয়ন হতো,' বললেন বেকুব তোষামোদের গুণধর জর্জীয় প্রিন্স।

তিনি জানতেন, নেপোলিয়নের নাম উচ্চারণ ভরন্তসভের কাছে মধুর, নেপোলিয়নকে হারিয়েই তিনি পুরস্কার হিসেবে তার গলায় পরা হোয়াইট ক্রসটি পেয়েছেন।

'ঠিক নেপোলিয়ন নয়, যদি বলেন, সম্ভবত ঘোড়সওয়ার দলের বীর হতে পারত,' বললেন ভরন্তসভ।

'নেপোলিয়ন, না হলে মুরাদ।'

'তার নাম হাজি মুরাদ!'

'হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছে, এখন শামিলও শেষ হয়ে যাবে,' কারও মন্তব্য।

'তারা এখন তা মনে করছে', এই 'এখন' মানে ভরন্তসভের অধীনে, 'তারা আর টিকে থাকতে পারবে না,' আরেকজনের মন্তব্য।

'সবই হয়েছে আপনার জন্য!' ফরাসিতে বললেন মানানা ওরবেলিয়ানি।

প্রিন্স ভরন্তসভ তার দিকে আসা তোষামোদের ঢেউ কমাতে চেষ্টা করলেন। তা সত্ত্বেও সেগুলো ভালো লাগছিল এবং খুব উদ্দীপ্ত হয়ে তাকে আবার বসার ঘরে নিয়ে গেলেন।

রাতের খাবারের পর বসার ঘরে কফি পরিবেশন করা হলে প্রিন্স সবার প্রতি খুব বিনয়ী ছিলেন এবং গুঁফো জেনারেলের কাছে গেলে এমন ভাব দেখাতে চেষ্টা করলেন যে জেনারেলের বিরাট ভুলটি গোচরেই আসেনি।

সব অতিথিকে কফি দিয়ে তিনি তাসের টেবিলে বসলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে খেলা অম্বে ছাড়া আর কিছু জানতেন না। প্রিন্সের সঙ্গে খেলছিলেন জর্জীয় প্রিন্স, একজন আর্মেনীয় জেনারেল (যিনি প্রিন্স ভরন্তসভের

BanglaBook.org

খানসামার কাছ থেকে খেলাটি শিখে নিয়েছেন) এবং চতুর্থজন ছিলেন ড. আন্দ্রিয়েভস্কি, প্রভাবশালী বলে যার অনেক সুনাম।

প্রিন্সের সোনার নস্যির কৌটাটির ঢাকনায় প্রথম আলেকজান্ডারের আবক্ষ প্রতিকৃতি খোদা, তিনি কৌটাটি পাশে রেখে খুব চকচকে একটি তাসের তোড়া খুলে বাটতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় তার ইতালীয় খানসামা গিওভানি রুপোর ট্রেতে করে আরেকটি চিঠি এনে তাকে দিল।

'আরেকজন দূত, মহাত্মন।'

ভরন্তসভ তাসগুলো রেখে ক্ষমা চেয়ে চিঠিটি পড়তে শুরু করলেন।

চিঠিটি লিখেছিল তার ছেলে, হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ ও মেলার-জাকোমেলস্কির সঙ্গে তার কথোপকথনের বর্ণনা দিয়ে।

প্রিন্সেস এসে জানতে চাইলেন তাদের ছেলে কী লিখেছে।

'সেই একই ঘটনা...(ফরাসি ভাষায়) সেখানকার অধিনায়কের সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটি হয়েছে। দোষ সিমোনের। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো।' চিঠিটি স্ত্রীর হাতে দিয়ে ইংরেজিতে তিনি শেষ করলেন। তারপর তার মেহমানদের দিকে ফিরে তিনি তাদের তাস টানতে বললেন।

প্রথম দফা বাটার পর, খোশমেজাজে থাকলে ভরন্তসভের যেমন অভ্যাস, তার সাদা কুঁচকে যাওয়া হাত দিয়ে ফরাসি নস্যির এক টিপ নাকের কাছে নিয়ে ভেতরে টানলেন।

১০

পরদিন হাজি মুরাদ প্রিন্সের প্রাসাদে হাজির হওয়ার আগেই দর্শনার্থীদের ঘরটি লোকজনে ভরে গিয়েছিল। সেখানে গতকালের গুঁফো জেনারেলও ছিলেন, বিদায় নিতে এসেছিলেন বলে তার পরনে ছিল সব কটি পদক লাগানো পুরো সামরিক পোশাক। উপস্থিত ছিলেন রসদের তহবিল তছরুপ করার অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচারের ঝুঁকিতে থাকা একজন রেজিমেন্ট অধিনায়ক। (ড. আন্দ্রিয়েভস্কির সুপারিশে) একজন ধনী মার্কিন নাগরিক এসেছিল সরকারের কাছ থেকে ভোদকা বিক্রির একচেটিয়া অনুমতি নবায়নের আশায়। যুদ্ধে নিহত একজন সামরিক কর্মকর্তার বিধবা কালো পোশাক পরে এসেছিল। উদ্দেশ্য, ভাতা বা সন্তানদের বিনা খরচে লেখাপড়ার সুবিধা পাওয়া। জাঁকালো পোশাক পরা এক উচ্ছন্নে যাওয়া জর্জীয় প্রিন্স

BanglaBook.org

এসেছিলেন বাজেয়াপ্ত করা গির্জার সম্পত্তি বরাদ্দ নিতে। সেখানে একজন কর্মকর্তার হাতে বিশাল একটা গোটান কাগজে ককেশাসকে আয়ত্তে আনার একটি পরিকল্পনা ছিল। একজন খানও উপস্থিত ছিল, যার একমাত্র উদ্দেশ্য প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করেছে, প্রতিবেশীদের কাছে এই অহংকার করা।

সবাই যার যার পালার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুন্দর চুলের একজন তরুণ এডিসি তাদের একজন একজন করে প্রিন্সের দপ্তরে ঢুকিয়ে আবার বের করে আনছিল।

হাজি মুরাদ চটপটেভাবে একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে ঘরে ঢুকলে সবার চোখ পড়ল তার দিকে, সে শুনতে পেল ঘরের বিভিন্ন দিকে লোকজন ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করছে।

তার পরনে ছিল কলারে সুন্দর কারুকাজ করা ফিতা লাগানো বাদামি বেশমেতের ওপর লম্বা সাদা চাপকান। কালো আঁটসাঁট পায়জামা এবং একই রঙের নরম জুতা, পায়ের পাতার সঙ্গে তা দস্তানার মতো লেগেছিল। তার মাথায় ছিল পাগড়িঘেরা লম্বা টুপি, প্রকাশ্যে আহমেদ খানের বিরোধিতা করার জন্য জেনারেল ক্লুগানু তাকে গ্রেপ্তার করার সময় ঠিক এই পাগড়িটাই তার মাথায় ছিল। ওই গ্রেপ্তারের কারণ তিনি শামিলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

হাজি মুরাদ দর্শনার্থীদের ঘরের নকশাকাটা কাঠের মেঝেয় চটপটেভাবে হেঁটে ঢুকেছিলেন। একটা পা খাটো থাকায় খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্য তার ঋজু শরীর সামান্য দুলছিল। শান্তভাবে তাকানো চোখ দুটি যেন কাউকে দেখছিল না।

সুদর্শন এডিসি তাকে স্বাগত জানিয়ে প্রিন্সের কাছে তার আগমনের খবর দেওয়ার আগে একটু বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু হাজি মুরাদ বসতে চাইলেন না এবং ছোরার ওপর হাত রেখে উপস্থিত সবার দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকালেন।

প্রিন্সের দোভাষী প্রিন্স তারখানভ হাজি মুরাদের কাছে এসে তার সঙ্গে কী বলল। হাজি মুরাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংক্ষেপে জবাব দিল। একজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আসা এক কুমিক প্রিন্স কামরা থেকে বের হয়ে এলে এডিসি হাজি মুরাদকে দরজার কাছে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার ইশারা করল।

তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ভরন্তসভ হাজি মুরাদকে স্বাগত জানালেন। প্রধান সেনাপতির সাদা মুখে গতকালের মতো স্মিত হাসি ছিল না, বরং মুখটা ছিল কঠিন ও গম্ভীর।

বিশাল টেবিল এবং ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড টানানো বড় বড় জানালার

BanglaBook.org

ঘরটিতে ঢুকে হাজি মুরাদ তার রোদে পোড়া ছোট হাত দুটো দিয়ে চাপকানের পাশ দুটো মেলার জায়গায় স্পর্শ করলেন। তারপর চোখ নামিয়ে তাড়াহুড়া না করে তাতার ভাষায় স্পষ্টভাবে শ্রদ্ধাভরে কথা বলতে শুরু করলেন কুমিক আঞ্চলিক টানে, এই টানটি তিনি ভালো বলতে পারেন।

'আমি মহান জারের প্রবল ক্ষমতা এবং আপনার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি,' তিনি বললেন, 'এবং কায়মনে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জারের সেবা করার প্রতিজ্ঞা করছি, এবং আমি আশা করি আপনাদের এবং আমার শত্রু শামিলের সঙ্গে যুদ্ধে আমি কাজে লাগতে পারব।'

দোভাষীর কথা শোনার পর ভরন্তসভ হাজি মুরাদের দিকে তাকালেন, হাজি মুরাদও তার দিকে তাকালেন।

দুজনের চোখে চোখে এত কথা হয়ে গেল, যা বলা যেত না এবং দোভাষীও তা কিছুতেই বোঝাতে পারত না। কোনো শব্দ ব্যবহার না করে তারা একে অন্যকে পুরো সত্য বলে দিল। ভরন্তসভের চোখ বলল হাজি মুরাদ যা বলেছেন, তার একটি শব্দও তিনি বিশ্বাস করেননি এবং তিনি জানেন হাজি মুরাদ যেকোনো রুশ জিনিসের শত্রু ছিলেন এবং থাকবেন, এখন আত্মসমর্পণ করছেন বাধ্য হয়ে। হাজি মুরাদ তা বুঝতে পারলেও নিজের সততা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে থাকলেন। তার চোখ বলেছিল, 'বুড়ো তার যুদ্ধের নয়, তার মৃত্যুর কথা ভাবছে; বুড়ো ধূর্ত তাই তাকে সাবধান হতে হবে।' ভরন্তসভ এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, তা সত্ত্বেও হাজি মুরাদের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার ব্যাপারে কথা বললেন।

'তাকে বলো,' ভরন্তসভ বললেন, 'আমাদের জার যেমন পরাক্রমশালী, তেমনি দয়ালু এবং হয়তো আমার অনুরোধে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে কাজে লাগাতে পারে...বলেছ তাকে?' হাজি মুরাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি আমার ঊর্ধ্বতনের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত তাকে আমার কাছে রেখে দেব এবং আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করব।' হাজি মুরাদ আবার তার বুকের কাছে হাত রেখে উৎফুল্লভাবে কিছু বলতে শুরু করলেন।

দোভাষী বলল, 'তিনি বলছেন ১৮৩৯ সালে আভারিয়ার শাসক থাকার সময় তিনি রুশদের বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছেন এবং তার শত্রু আহমেদ খান তার ক্ষতি করার জন্য জেনারেল ক্লুগেনুর কাছে তার দুর্নাম না করা পর্যন্ত রুশদের ছেড়ে যাননি।'

ভরন্তসভ বললেন, 'জানি জানি,' (যেন তিনি তা আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন)। 'জানি,' বলে ভরন্তসভ হাজি মুরাদকে দেয়ালের পাশের সোফায় বসতে ইশারা করলেন। কিন্তু হাজি মুরাদ বসলেন না।

BanglaBook.org

একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের সামনে বসবেন কি না, মনস্থির করতে পারছেন না, তার শক্তিশালী কাঁধ নাড়িয়ে বোঝালেন হাজি মুরাদ।

তারপর দোভাষীর মাধ্যমে বলতে শুরু করলেন, 'আহমেদ খান ও শামিল—দুজনেই আমার শত্রু। প্রিন্সকে বলো যে আহমেদ খান মৃত আর আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারি না; কিন্তু শামিল বেঁচে আছে, তার ওপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি মরব না,' জেদে ভুরু কুঁচকে মুখ শক্ত করে বললেন হাজি মুরাদ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ; কিন্তু তিনি কী করে শামিলের ওপর প্রতিশোধ নেবেন?' শান্তভাবে ভরন্তসভ বললেন দোভাষীকে। 'তাকে বলো তিনি বসতে পারেন।'

হাজি মুরাদ আবারও বসতে অস্বীকার করলেন; প্রশ্নের জবাবে বললেন রুশদের কাছে তার আসার উদ্দেশ্য শামিলকে ধ্বংস করতে তাদের সাহায্য করা।

'বেশ, বেশ, কিন্তু তিনি ঠিক কী করতে চান?' ভরন্তসভ বললেন, 'বসুন, বসুন।'

হাজি মুরাদ বসে বললেন একদল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাকে লেসগিয়ার সীমায় পাঠিয়ে দিলে তিনি নিশ্চিতভাবে দাগেস্তান দখলে নিতে পারবেন এবং শামিলের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

'চমৎকার হবে। আমি ভেবে দেখব,' ভরন্তসভ বললেন।

দোভাষী তা বুঝিয়ে দিল।

হাজি মুরাদ চিন্তায় পড়লেন।

'সরদারকে আরেকটা কথা বলো,' হাজি মুরাদ আবার শুরু করলেন। 'আমার পরিবার আমার শত্রুর হাতে। তারা যত দিন সেখানে থাকবে, তত দিন আমি কিছু করতে পারব না। আমি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধে গেলে শামিল আমার স্ত্রী, আমার মা এবং সন্তানদের মেরে ফেলবে। প্রিন্স আগে বন্দীদের বদলে আমার পরিবারকে ছাড়িয়ে আনলে আমি পরে শামিলকে শেষ করে দেব, না হয় মরে যাব!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভরন্তসভ বললেন। 'আমি ভেবে দেখব। এখন তাকে সেনাপ্রধানের কাছে গিয়ে তার অবস্থা ও পরিকল্পনা বলতে বলো।'

হাজি মুরাদ ও ভরন্তসভের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ এভাবেই শেষ হলো।

সন্ধ্যায় প্রাচ্যরীতিতে সাজানো নতুন থিয়েটারে একটি ইতালীয় অপেরা মঞ্চস্থ হচ্ছিল। ভরন্তসভ তার কুঠুরিতে বসে ছিলেন। তখন মঞ্চের কাছের আসনগুলোর দিকে খুঁড়িয়ে চলা হাজি মুরাদের চোখে পড়ার মতো পাগড়ি মাথায় অবয়ব দেখা গেল। ভরন্তসভের এডিসি লরিস-মেলিকভের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। লরিস-মেলিকভের ওপর তার দেখাশোনার ভার পড়েছিল।

BanglaBook.org

হাজি মুরাদ সামনের সারির একটি আসনে বসলেন। প্রথম অঙ্কের সময়টা প্রাচ্যের ভাবলেশহীন, নিরানন্দ কঠোর-মুখো অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে কাটিয়ে হাজি মুরাদ উঠে দাঁড়ালেন এবং চারদিকের দর্শকদের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বের হয়ে গেলেন।

পরদিন সোমবার, ভরন্তসভের বাড়িতে নিয়মিত ভোজের আয়োজন। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বিশাল ঘরে গাছগুলোর আড়ালে বাদকদল বাজাচ্ছিল। তরুণী এবং ততটা তরুণী নয় মহিলারা বুক, বাহু ও কাঁধের ওপরের দিক খোলা পোশাকে ঝকঝকে সামরিক পোশাক পরা পুরুষদের জড়িয়ে কেবল ঘুরছিল আর ঘুরছিল। খাবার সাজানো টেবিলে লাল হংসপুচ্ছ কোট এবং হাঁটু পর্যন্ত আঁটা পাতলুন ও জুতা পরা খানসামারা মহিলাদের শ্যাম্পেন ও মিষ্টি খাবার বেঁটে দিচ্ছিল। বয়স হওয়া সত্ত্বেও 'সরদারের' স্ত্রী তেমনি আধো পোশাকে আমন্ত্রিতদের ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিলেন। শিষ্ট হাসিমুখে দোভাষীর মাধ্যমে নির্বিকারভাবে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে থাকা হাজি মুরাদকে ভদ্রভাবে দু-একটি কথা বললেন। গৃহকর্তৃর পর অন্যান্য আধা উলঙ্গ মহিলারা হাজি মুরাদের কাছে এসে নিঃসংকোচে তার সামনে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন করল : সবকিছু কেমন লাগছে? কাঁধে সোনালি বিহ্ন ও পাকানো রজ্জু এবং গলায় তার হোয়াইট ক্রস ঝুলিয়ে ভরন্তসভও তার কাছে এসে একই প্রশ্ন করলেন। স্পষ্টত নিশ্চিত হয়ে যে যা দেখছে তা ভালো না লেগে হাজি মুরাদের উপায় নেই। হাজি মুরাদ ভরন্তসভের কথার জবাব দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন অন্য সবাইকে, তাদের সমাজে এমন কিছু হয় না। ভালো কি মন্দ, সে রকম কোনো মন্তব্য না করে।

নাচের এই আসরে হাজি মুরাদ ভরন্তসভকে তার পরিবার সম্পর্কে বলার চেষ্টা করল; কিছুই শুনতে পাননি, এমন ভাব করে ভরন্তসভ চলে গেলেন। পরে লরিস-মেলিকভ হাজি মুরাদকে বলল যে তখন কাজের কথা বলার উপযুক্ত সময় নয়।

১১টা বাজলে হাজি মুরাদ ভরন্তসভদের দেওয়া ঘড়িতে সময় দেখে লরিস-মেলিকভকে জিজ্ঞেস করল সে যেতে পারে কি না। লরিস-মেলিকভ বলল সে যেতে পারে কিন্তু থেকে যাওয়া ভালো। তা সত্ত্বেও হাজি মুরাদ থাকলেন না; তার ব্যবহারের জন্য দেওয়া ফিটন গাড়িতে চড়ে তাকে দেওয়া বাড়িতে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

১১

তিবলিসে হাজি মুরাদের পাঁচ দিনের দিন ভাইসরয়ের আদেশে তার এডিসি লরিস-মেলিকভ হাজি মুরাদের সঙ্গে দেখা করতে এল।

'আমার মাথা ও হাত সরদারের সেবা করতে আনন্দিত,' হাজি মুরাদ তার স্বাভাবিক কূটনৈতিক সৌজন্যে তার মাথা নিচু করে এবং দুহাত বুকের ওপর রেখে বললেন। নম্রভাবে লরিস-মেলিকভের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আদেশ করুন!'

লরিস-মেলিকভ টেবিলের পাশে রাখা একটা আরামকেদারায় বসলেন, হাজি মুরাদ বসলেন তার উল্টো দিকের একটি গদিতে, হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে। অন্যজনের কথা ভালো করে শোনার জন্য তিনি মাথা কাত করে ছিলেন।

লরিস-মেলিকভ বললেন হাজি মুরাদের অতীত সম্বন্ধে প্রিন্স জানলেও এখনকার অবস্থা পুরোপুরি জানতে চান। লরিস-মেলিকভ স্বচ্ছন্দে তাতার বলতে পারতেন।

'আমাকে বলুন, আমি লিখে নিয়ে তা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে দিলে প্রিন্স সেটা সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

হাজি মুরাদ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন (অন্যে কথা বলতে থাকলে তিনি কখনো থামান না এবং যে বলছিল, তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকেন এই ভেবে যে অন্যজন হয়তো আরও কিছু বলবে)। তারপর তিনি মাথা তুলে টুপিটা নেড়ে বসালেন এবং তার সেই অদ্ভুত শিশুসুলভ হাসি হাসলেন, যে হাসি মারিয়া ভাসিলিয়েভনাকে মুগ্ধ করেছে।

সম্রাট তার কাহিনি পড়বেন, এই ভেবে খুশি হয়ে বললেন, 'আমি বলব।'

'তুমি আমাকে সব বলবে, (তাতার ভাষায় সম্মানসূচক 'তুমি' নেই, তাই সাধারণ 'তুমি'ই তিনি বললেন) সব বলবে, একদম প্রথম থেকে,' বলে লরিস-মেলিকভ একটা নোটবই বের করলেন।

'আমি বলব, কিন্তু সে তো অনেক অনেক কথা। কত ঘটনা ঘটেছে,' হাজি মুরাদ বললেন।

'তুমি সব এক দিনে বলতে না পারলে আরও সময় নিতে পারো,' বললেন লরিস-মেলিকভ।

'আমি কি একদম গোড়া থেকে শুরু করব?'

'হ্যাঁ, একদম গোড়া থেকে—তোমার জন্ম, তুমি যেখানে থাকতে, সেখান থেকে।'

হাজি মুরাদ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর গদির

BanglaBook.org

পাশে রাখা একটা লাঠি হাতে নিলেন। খাপ থেকে হাতির দাঁতের ওপর সোনায় খোদাই করা হাতলের একটি ক্ষুরধার ছোরা বের করলেন। তারপর ছোরাটি দিয়ে লাঠিটার ওপর অল্প অল্প করে কাটতে আর কথা বলতে শুরু করলেন।

'লিখুন: জন্ম তসেলমেস গ্রামের ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে। আমরা পাহাড়িরা যাকে গাধার মাথার মতো ছোট বলি,' বললেন তিনি। 'এর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কামানের দুই গোলার প্রায় সমান দূরে ছিল খুনজাখ। সেখানে খানরা থাকত। তাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

'আমার সবচেয়ে বড় ভাই ওসমানের যখন জন্ম হয়, আমার মা তখন সবচেয়ে বড় খান আবু নুতসাল খানের দুধ-মা ছিলেন। তারপর তিনি খানের দ্বিতীয় ছেলে উম্মা খানকেও পেলে বড় করেন। আমার দ্বিতীয় ভাই আহমেদ তখন মারা যায়। আমার জন্ম হওয়ার সময় খান সাহেবের বেগম বুলাচ খানকে পেটে ধরেন। আমার মা তখন আর দাই হিসেবে যাননি। বাবা তাকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু মা যাননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার আরেকটা ছেলেকে মেরে ফেলব না; আমি যাব না।' আমার জেদি বাবা তখন তাকে ছোরা বসিয়ে দেন। সবাই তাকে বাবার হাত থেকে না বাঁচালে তিনি মরেই যেতেন। মা আমাকে ছেড়ে যাননি, তারপর তিনি একটা গান বানিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেটা বলব না।

'আমার মা দাই-মা হিসেবে গেলেন না,' মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, খান সাহেবের বেগম আরেকজন দাই জোগাড় করেন। কিন্তু আমার মাকে তিনি পছন্দ করতেন। মা আমাদের নিয়ে তাদের বাড়িতে যেতেন। আমরা তার ছেলেদের সঙ্গে খেলতাম, তিনি আমাদেরও আদর করতেন।

'খানদের তিন ছেলে: আবু নুতসাল খান, আমার ভাই ওসমানের পালক ভাই উম্মা খান এবং আমার ধর্মভাই বুলাচ খান। বুলাচ সবচেয়ে ছোট, শামিল তাকে খাড়া পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল, সেটা পরের কথা।

'আমার বয়স যখন ষোলো, মুরিদরা তখন গ্রামে আসতে শুরু করে। তারা পাথরের ওপর কাঠের খঞ্জর (ছোট বাঁকা তরবারি) দিয়ে শব্দ করত আর চিৎকার করে বলত, "মুসলমানরা, জিহাদ আসছে!" চেচেনরা মুরিদদের সঙ্গে যোগ দিল। আভাররাও যেতে শুরু করে। আমি তখন প্রাসাদে থাকতাম খানদের ভাই হিসেবে। আমি যা খুশি করতে পারতাম। বেশ ধনী হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ঘোড়া, অস্ত্র ও টাকা—সবই ছিল। আমি তখন বেপরোয়া, ফুর্তিতে জীবন কাটাই। এ রকম চলছিল ইমাম কাজি-মোল্লা নিহত হওয়া পর্যন্ত। তার জায়গায় এল হামজাদ। হামজাদ খানদের কাছে

BanglaBook.org

দূত পাঠিয়ে জানাল তারা জিহাদে যোগ না দিলে খুনজাখ ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

'এটা ভাবনার বিষয় ছিল। খানরা রুশদের ভয় করত। জিহাদে যোগ দিতেও ভয় করত। বুড়ি বেগম আমাকে আর তার দ্বিতীয় ছেলে উম্মা খানকে তিবলিসে পাঠালেন। হামজাদের বিরুদ্ধে রুশ সেনাপতির সাহায্যের আশায়। তিবলিসে রুশ সেনাপতি ছিলেন ব্যারন রোজেন। তিনি আমার বা উম্মা খানের সঙ্গে দেখা করলেন না। তিনি সাহায্যের কথা বলে পাঠালেন, কিন্তু কিছুই করলেন না। শুধু কয়েকজন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে এলেন আর উম্মা খানের সঙ্গে তাস খেলে গেলেন। তারা তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে খারাপ সব জায়গায় নিয়ে যেতেন। উম্মা খান তাদের কাছে তাস খেলায় সব হারান। তিনি ছিলেন ষাঁড়ের মতো জোয়ান, সিংহের মতো সাহসী কিন্তু তার মন ছিল খুব নরম। আমি তাকে বাধা না দিলে তিনি জুয়ায় তার সবকিছু হারাতেন।

'তিবলিস ঘুরে আসার পর আমার ধারণা বদলে যায়। আমি বুড়ি বেগম আর খানদের জিহাদে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দিলাম।'

'তোমার মত বদলে গেল কেন?' লরিস-মেলিকভ জিজ্ঞেস করল। 'তুমি রুশদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলে না?'

হাজি মুরাদ থামলেন।

'না, আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না,' চোখ মুদে পরিষ্কার বললেন। 'আরেকটা কারণে আমি জিহাদে যোগ দিতে চেয়েছিলাম।'

'সেটা কী?'

'তসেলমেসের কাছে আমি ও উম্মা তিনজন মুরিদের মুখোমুখি হই। তাদের দুজন পালিয়ে যায়, তৃতীয়জনকে আমি পিস্তল দিয়ে গুলি করি।

'আমি তার অস্ত্রগুলো নিতে কাছে গেলে দেখি সে বেঁচে আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে মেরে ফেলছ। আমি খুশি, কিন্তু তুমি একজন মুসলমান, সবল তরুণ। জিহাদে যোগ দাও, আল্লাহ তাই চান!"'

'এবং তুমি যোগ দিলে?'

'না, কিন্তু কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল,' হাজি মুরাদ গল্পটা বলতে থাকলেন।

'হামজাদ খুনজাখের দিকে এলে মুরব্বিদের তার কাছে পাঠালাম এই বলে যে আমরা জিহাদে যোগ দিতে রাজি আছি, যদি ইমাম আমাদের বোঝাতে একজন জ্ঞানী লোককে পাঠান। হামজাদ মুরব্বিদের গোঁফ কামিয়ে, নাকে ফুটো করে তাতে পিঠা ঝুলিয়ে দিল। এই অবস্থায় তাদের আমাদের কাছে ফেরত পাঠাল।

BanglaBook.org

'মুরব্বিদের কাছে বলে দিল যে সে জ্ঞানী কাউকে পাঠাতে পারে, যদি বেগম সাহেবা তার ছোট ছেলেকে জামিন হিসেবে পাঠান। তিনি তার কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলে বুলাচ খানকে পাঠিয়ে দিলেন। হামজাদ তাকে সাদরে গ্রহণ করে বড় দুই ভাইকেও দাওয়াত পাঠাল। সে বলে পাঠাল যে তার বাবা খানদের বাবাকে যেমন সেবা করেছে, সে-ও খানদের তেমন সেবা করতে চায় আর সব একা মহিলার মতো বেগমও একজন দুর্বল, বোকা ও অহংকারী ছিলেন। তিনি দুই ছেলেকেই পাঠাতে ভয় পেলেন এবং কেবল উম্মা খানকে পাঠালেন। আমি তার সঙ্গে গেলাম। পৌঁছার মাইলখানেক আগেই আমাদের সঙ্গে মুরিদদের দেখা হলো। তারা আমাদের ঘিরে গান গাইতে গাইতে ঘোড়া নিয়ে আধা বৃত্তে নাচল। কাছাকাছি গেলে হামজাদ তাঁবু থেকে বের হয়ে উম্মা খানের ঘোড়ার পাদানি ধরে তাকে খানের মতো স্বাগত জানিয়ে নামাল। সে বলল, "আমি তোমাদের পরিবারের কোনো ক্ষতি করিনি, করতেও চাই না। আমাকে মেরে ফেলো না, আর লোকদের জিহাদে নামানোর কাজে আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি আমার পুরো বাহিনী দিয়ে তোমাদের সেবা করব, যেভাবে আমার বাবা তোমাদের বাবাকে সেবা করেছে! আমাকে তোমাদের বাড়িতে থাকতে দাও। আমি তোমাদের পরামর্শ দেব এবং তোমরা যা খুশি করতে পারবে।"

'উম্মা খান কথা বলতে পারছিল না, বুঝতে পারছিল না কী বলতে হবে। তাই সে চুপ করে থাকল। আমি বললাম, তা-ই যদি হয়, তাহলে হামজাদ খুনজাখে আসতে পারে। বেগম ও খানরা তাকে সাদরে বরণ করবে কিন্তু আমার কথা শেষ করতে দেওয়া হলো না, তখনই আমি শামিলকে প্রথম দেখি। সে ইমামের পাশে ছিল। সে আমাকে বলল,

"তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, খান বলবে!"

'আমি চুপ করে গেলাম। হামজাদ উম্মা খানকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল। তারপর হামজাদ আমাকে ডেকে তার দূতদের নিয়ে খুনজাখে যেতে বলল। আমি সেখানে গেলাম। দূতরা তার বড় ছেলেকেও হামজাদের কাছে পাঠানোর জন্য বেগমকে বোঝাতে শুরু করল। আমার মনে হলো, সেটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আমি তাকে বড় ছেলেকে পাঠাতে বারণ করলাম। কিন্তু মহিলাদের মাথায় ঘিলুর পরিমাণ খুবই কম। তিনি তার ছেলেকে যেতে বললেন। আবু নুতসাল খান যেতে চায়নি। তখন বেগম বললেন, "বুঝেছি, তুমি ভিতু!" তিনি মৌমাছির মতো জানতেন কোথায় হুল ফোটালে সে সবচেয়ে কাতর হবে। আবু নুতসাল খান লাল হয়ে গেল এবং বেগমের সঙ্গে আর কথা বলল না। তার ঘোড়া তৈরি করতে বলল। সঙ্গে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

'হামজাদ আমাদের আরও সম্মান দেখাল। নিজে অভ্যর্থনা করল বন্দুকের দুই গুলি দূরত্বে নেমে এসে। বড় একটি অশ্বারোহী দল এবারও বাতাসে গুলি ছুড়ল, আমাদের ঘিরে গাইল এবং ঘোড়া নিয়ে আধা বৃত্তে নাচল।

'শিবিরে পৌঁছালে খানকে নিয়ে তার তাঁবুতে চলে গেল হামজাদ আর আমি থাকলাম ঘোড়াগুলো নিয়ে।

'আমি পাহাড়ের ঢালের অনেকটা নিচে থেকে হামজাদের তাঁবুতে গুলির আওয়াজ শুনলাম। দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি, উম্মা খান রক্তে ভাসছে আর আবু নুতসাল মুরিদদের সঙ্গে লড়ছে। তার একটা গাল কেটে ঝুলছে। এক হাতে সেটা চেপে ধরে, আর অন্য হাতের ছোরা দিয়ে কাছে যে আসছে, তাকেই কোপাচ্ছে। হামজাদের ভাইকে কোপ মেরে ফেলে দিতে দেখলাম। আরেকজনকে আঘাত করতে গেলে মুরিদরা তাকে গুলি করে ফেলে দেয়।'

হাজি মুরাদ থামলেন। তার রোদে পোড়া মুখ আর চোখ ভাটার মতো লাল।

'আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম।'

'সত্যি? আমি ভেবেছি তুমি ভিতু নও,' লরিস-মেলিকভ বলল।

'তারপর থেকে না, তারপর থেকে আমার সেই লজ্জার কথা মনে আছে। তা মনে পড়লে আমি আর কিছুই ডরাই না!'

১২

'বেশ, আর না! নামাজের সময় হয়েছে,' বলে হাজি মুরাদ দোকানের বুকপকেট থেকে ভরন্তসভদের দেওয়া ঘণ্টা বাজানো ঘড়িটা (রিপিটার ঘড়ি) বের করে সাবধানে স্প্রিংয়ের ওপর চাপ দিলেন। সোয়া ১২টার ঘণ্টা বাজল। মাথাটা একদিকে কাত করে মুখে হালকা হাসি নিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো হাজি মুরাদ তা-ই শুনলেন।

'বন্ধু ভরন্তসভের উপহার,' হেসে বললেন হাজি মুরাদ।

'খুব ভালো ঘড়ি,' লরিস-মেলিকভ বলল। 'তাহলে তুমি নামাজ পড়ো, আমি বসে আছি।'

'ঠিক আছে,' বলে হাজি মুরাদ তার শোবার ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে একা থাকায় লরিস-মেলিকভ হাজি মুরাদের কথাগুলো মিলিয়ে দেখল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

BanglaBook.org

শোবার ঘরের দরজাটার উল্টো দিকের দরজার কাছে গিয়ে সে শুনতে পেল কয়েকজন লোক তাতারি ভাষায় উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। সে মনে করল, তারা হাজি মুরাদের মুরিদ। দরজা খুলে বের হয়ে সে তাদের কাছে গেল। ঘরটা পাহাড়িদের গায়ের কটু গন্ধে ভরে আছে। মেঝেয় একটা বিছানো চাদরের ওপর বসে একচোখা লালচুলো গামজালো বসে। গায়ে একটি তেলচিটে ছেঁড়াফাটা বেশমেত। সে লাগামের দড়ি পাকাতে পাকাতে উত্তেজিতভাবে হেঁড়ে গলায় কিছু বলছিল। লরিস-মেলিকভ ঘরে ঢুকলে সে থেমে গেল। তার দিকে কোনো নজর না দিয়ে সে হাতের কাজ চলিয়ে গেল। খোশমেজাজি খান মাহোমা দাঁড়িয়ে ছিল গামজালোর সামনে। তার সাদা দাঁতগুলো বের করে, তার কালো পাপড়িহীন চোখ চকচক করছিল। সে কোনো কিছু বলছিল বারবার। সুদর্শন এলডারের সবল বাহুর ওপর আস্তিন গোটানো। সে একটি পেরেকে ঝোলানো জিনের পেটি পালিশ করছিল। মূল সহকারী খানেফি সেখানে ছিল না। বাড়ি দেখাশোনার ভার তার ওপর। সে রান্নাঘরে খাবার রাঁধছিল।

তাদের সালাম দিয়ে লরিস-মেলিকভ জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে তর্ক করছ?'

'সে সব সময় শামিলের গুণ গায়,' লরিস-মেলিকভের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল খান মাহোমা। 'সে বলে শামিল ভালো মানুষ, জ্ঞানী, পবিত্র এবং দক্ষ ঘোড়সওয়ার।'

'সে তাকে ছেড়ে এসেও কী করে তার প্রশংসা করে?'

'সে তাকে ছেড়ে এসেছে, তারপরও প্রশংসা করে।' আবার বলল খান মাহোমা।

'সে আসলেই শামিলকে পীর মনে করে?' জিজ্ঞেস করল লরিস-মেলিকভ।

'সে পীর না হলে লোকে তার কথা শুনত না,' গামজালোর চটজলদি জবাব।

'শামিল না, মনসুর পীর ছিল,' জবাব দিল খান মাহোমা। সে-ই ছিল আসল পীর। সে ইমাম থাকার সময় মানুষ অন্য রকম ছিল। সে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলে লোকজন তার কাপড়ের কিনার ধরে চুমু খেয়ে পাপ স্বীকার করত এবং আর পাপ না করার ওয়াদা করত। মুরব্বিরা বলে, তখন সব মানুষ পীরদের মতো ছিল। মদ খেত না, সিগারেট খেত না, নামাজ বাদ দিত না, খুনোখুনি হলেও অন্যদের দোষ মাফ করে দিত। টাকাপয়সা কুড়িয়ে পেলে লাঠির আগায় বেঁধে রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখত। তখন আল্লাহ মানুষকে কামিয়াব করত—এখনকার মতো না।'

BanglaBook.org

'পাহাড়িরা এখনো মদ-সিগারেট খায় না,' বলল গামজালো।

'তোমার শামিল একটা "লামোরি",' লরিস-মেলিকভের দিকে চোখ টিপে খান মাহোমা বলল। (লামোরি মানেও পাহাড়ি, তবে খারাপ অর্থে।)

'হ্যাঁ, লামোরি মানেও পাহাড়ি,' গামজালো বলল। 'যে পাহাড়ে ইগল থাকে।'

'দারুণ, ঠিক বলেছ!' পাল্টা জবাবে খুশি হয়ে হেসে খান মাহোমা বলল।

লরিস-মেলিকভের হাতে সিগারেটের রুপার কৌটা দেখে খান মাহোমা একটা সিগারেট চাইল। লরিস-মেলিকভ চোখ টিপে হাজি মুরাদের ঘরের দিকে ইশারা করে বলল, সিগারেট খাওয়া তো নিষেধ। খান মাহোমার মন্তব্য, না দেখলে অসুবিধা নেই। সে সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটে টান দিয়ে না গিলে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করল। তার অনভ্যস্ত লাল ঠোঁট অদ্ভুত কায়দায় গোল করে।

'এটা ঠিক নয়!' জোরে বলে গামজালো ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

খান মাহোমা তার পেছনে আবার চোখ টিপল। সিগারেট টানতে টানতে লরিস-মেলিকভকে জিজ্ঞেস করল একটা রেশমি বেশমেত আর সাদা টুপি কোথায় ভালো পাওয়া যাবে।

'তোমার কি অত টাকা আছে?'

'হ্যাঁ, কেনার মতো টাকা আছে।'

'জিজ্ঞেস করো টাকা সে পেল কোথায়,' সুদর্শন মুখে হাসি ছড়িয়ে লরিস-মেলিকভকে বলল এলডার।

'আমি জিতেছি।' খান মাহোমা চট করে জবাব দিল। তারপর বলল কেমন করে জিতেছে। আগের দিন তিবলিসে হাঁটতে গিয়ে রাস্তার ওপর কয়েকজন রুশ ও আর্মেনীয়কে অর্লিয়াঙ্কা (পয়সার এপিঠ-ওপিঠ ধরনের খেলা) খেলতে দেখে। বাজি ছিল তিনটি সোনার এবং অনেক রুপার টাকা। খান মাহোমা সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে যায়। তার পকেটের পয়সাগুলো ঝনঝন করে সব টাকা বাজি ধরার কথা জানায়।

'তুমি কী করে করলে, তোমার কত ছিল?' লরিস-মেলিকভ জিজ্ঞেস করল।

'আমার কাছে ছিল বারো কোপেক,' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে জবাব দিল খান মাহোমা।

'বেশ, হারলে কী করতে?'

'কেন, এই দেখো!' তার পিস্তলটি দেখিয়ে বলল খান।

'তুমি ওটা দিয়ে দিতে?'

'দেব কেন? আমি দৌড় দিতাম, কেউ পিছু নিলে গুলি করে মেরে ফেলতাম...সব খতম!'

BanglaBook.org

'তাহলে তুমি জিতেছ?'

'হ্যাঁ, আমি সব জিতে নিয়ে এসেছি!'

লরিস-মেলিকভ বেশ বুঝে গেল খান মাহোমা, এলডার কেমন মানুষ। খান মাহোমা আমুদে, বেপরোয়া আর যেকোনো হইহল্লার জন্য প্রস্তুত। তার উপচে পড়া জীবনশক্তি নিয়ে কী করা উচিত, সে জানে না। সে সব সময়ই আনন্দে থাকে আর হঠকারী। নিজের ও অন্যদের জীবন নিয়ে খেলতে সে ভালোবাসে। জীবন নিয়ে খেলতেই সে রুশদের কাছে এসেছে। একই কারণে সে শামিলের সঙ্গেও যোগ দিতে পারে।

এলডারকে বোঝা সহজ। সে তার নেতার (মুরশিদ) প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত। শান্ত, সবল ও দৃঢ়।

একমাত্র গামজালোকে লরিস-মেলিকভ বুঝতে পারেনি। লোকটা কেবল শামিলের প্রতি বিশ্বস্ত নয়, রুশদের প্রতি তার অনীহা, অবজ্ঞা, বিরোধিতা ও ঘেন্না অদম্য। তাই সে বুঝতে পারেনি গামজালো কেন রুশদের কাছে এসেছে। লরিস-মেলিকভের মনে হলো হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ, শামিলের সঙ্গে শত্রুতার গল্প প্রতারণাও হতে পারে। কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও সে রকম সন্দেহ করেন। হয়তো সে রুশদের দুর্বলতাগুলো জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি করতেই আত্মসমর্পণ করেছে। হয়তো পাহাড়ি এলাকায় ফিরে গিয়ে তার বাহিনীকে সেভাবে কাজে লাগাবে। গামজালো লোকটি এই সন্দেহ পাকা করে দিল।

'হাজি মুরাদসহ অন্যরা নিজেদের মনের কথা গোপন রাখতে জানে, কিন্তু এই লোকটি তা করতে না পেরে তাদের সঙ্গে বেইমানি করছে,' লরিস-মেলিকভ ভাবল।

লরিস-মেলিকভ তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। তাকে জিজ্ঞেস করল একঘেয়ে লাগছে কি না। হাতের কাজ না থামিয়ে সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'না, লাগছে না।' আড়চোখে সে লরিস-মেলিকভকে দেখে নিল। লরিস-মেলিকভের সব প্রশ্নের জবাব দিল সে একইভাবে।

লরিস-মেলিকভ ঘরে থাকতেই হাজি মুরাদের আরেক আভার মুরিদ খানেফি ঘরে ঢোকে। তার মুখ, ঘাড় ও চওড়া বুক এত রোমশ যে মনে হয় শেওলাঢাকা। সে সবল, কঠোর পরিশ্রমী ও সব সময় কাজে নিবিষ্ট। এলডারের মতো সে-ও প্রশ্নাতীতভাবে মনিবের বাধ্য।

কিছু চাল নেওয়ার জন্য ঘরে ঢুকলে লরিস-মেলিকভ তাকে থামিয়ে জানতে চাইল বাড়ি কোথায় এবং কত দিন ধরে হাজি মুরাদের সঙ্গে আছে।

'পাঁচ বছর,' বলল খানেফি। 'আমাদের বাড়ি একই গ্রামে। আমার বাবা তার চাচাকে খুন করে। তারা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল,' শান্ত গলায়

BanglaBook.org

বলল খানেফি। তার জোড়া ভুরুর নিচের চোখ দুটো দিয়ে সোজাসুজি লরিস-মেলিকভের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'তখন আমি তাকে ধর্মভাই ডাকি!'

'ধর্মভাই কী?'

'আমি দুই মাস আমার চুল-নখ কাটা বন্ধ করে তাদের কাছে আসি। তারা আমাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়। সে আমাকে তার বুকের দুধ দেয়। আর আমি তার ভাই হয়ে গেলাম।'

পাশের ঘরে হাজি মুরাদের গলা শোনা যাচ্ছিল। এলডার তার ডাকে জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত মুছে বসার ঘরে গেল।

'আপনাকে যেতে বলেছে,' ফিরে এসে সে বলল।

লরিস-মেলিকভ আমুদে খান মাহোমাকে আরেকটা সিগারেট দিয়ে বসার ঘরে চলে গেল।

১৩

লরিস-মেলিকভ বসার ঘরে এলে হাজি মুরাদ উজ্জ্বল হাসি হেসে তাকে স্বাগত জানালেন।

'আমরা শুরু করব?' গদিতে আরাম করে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল লরিস-মেলিকভ। 'তোমার লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলাম...একজন বেশ মজার!'

'হ্যাঁ, খান মাহোমা একটু চপল স্বভাবের।'

'তরুণ সুদর্শন ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'ওহ্, এলডার। সে তরুণ কিন্তু বেশ শক্ত—লোহায় বানানো।'

তারা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

'তাহলে আমি শুরু করি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তোমাকে বলেছি খানদের কীভাবে খুন করা হয়েছে...। তাদের খুন করে হামজাদ খুনজাখে এসে তাদের প্রাসাদ দখল করল। পরিবারের একমাত্র বেগম সাহেবাই বেঁচে ছিলেন। হামজাদ তাকে ধরে আনতে গেলে তিনি বাধা দেন। তখন হামজাদের ইশারায় তার মুরিদ আসেলদার পেছন থেকে ছুরি মেরে তাকে হত্যা করে।'

'তাকে হত্যা করল কেন?' লরিস-মেলিকভের প্রশ্ন।

BanglaBook.org

'সে আর কী করতে পারত? সামনের পাগুলো যেদিকে যাবে, পেছনের পাকেও সেদিকেই যেতে হবে। সে পুরো পরিবারকে মেরে ফেলল। শামিল ছোট ছেলেটাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুড়ে ফেলল...

'তারপর পুরো আভার হামজাদের কাছে নত হলো। কিন্তু আমার ভাই আর আমি ধরা দিলাম না। আমরা খানদের খুনের বদলে তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। আমরা ধরা দেওয়ার ভান করলাম কিন্তু আমাদের মাথায় এক চিন্তা, কীভাবে তাকে শেষ করব। আমার দাদার সঙ্গে আলাপ করলাম। ঠিক করলাম সে প্রাসাদের বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর চোরাগোপ্তা হামলা করে তাকে খুন করব। কেউ একজন আমাদের কথা শুনে ফেলে হামজাদকে বলে দেয়। সে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে বলল, 'তোমার নাতিরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি এবং তারা ঘরের আড়াকাঠে ঝুলবে। আমি আল্লাহর কাজ করছি। এতে বাধা দেওয়া যাবে না। যাও আর কথাগুলো মনে রেখো!'

'দাদা বাড়ি এসে আমাদের বলল।

'আমার আর দেরি করতে চাইলাম না। ঠিক করলাম, মসজিদে ঈদের দিন কাজ শেষ করব। আমাদের সহযোগীরা আসতে চাইল না। কিন্তু আমি আর আমার ভাই অনড়।

'আমরা দুটো করে পিস্তল চাদরের ভেতর নিয়ে মসজিদে গেলাম। হামজাদ মসজিদে ঢুকল জনা তিরিশেক মুরিদ নিয়ে। তাদের সবার হাতে তলোয়ার। তার সবচেয়ে প্রিয় মুরিদ আসেলদার (যে বেগম সাহেবার মাথা কেটে আলাদা করেছিল) আমাদের দেখে ফেলল। চিৎকার করে আমাদের চাদর খুলতে বলে আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমার হাতের ছোরা দিয়ে তাকে খুন করে আমি হামজাদের দিকে ছুটে যাই। আমার ভাই ওসমান এর মধ্যেই তাকে গুলি করেছিল। কিন্তু সে মরেনি। ছোরা হাতে আমার ভাইয়ের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু মাথায় ছোরা মেরে আমি তাকে শেষ করে দিলাম। মুরিদ ছিল তিরিশজন আর আমরা মাত্র দুজন। তারা আমার ভাই ওসমানকে মেরে ফেলল। আমি তাদের ঠেকিয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে এলাম।

'হামজাদ খুন হয়েছে জানতে পেরে সব লোক বিদ্রোহ করল। মুরিদরা পালিয়ে গেল; যারা পালায়নি, তাদের মেরে ফেলা হলো।'

একটু থেমে হাজি মুরাদ লম্বা শ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'ওই পর্যন্ত ভালো ছিল, কিন্তু তারপর সব গোলমাল হয়ে গেল।

'হামজাদের জায়গায় নিল শামিল। সে রুশদের বিরুদ্ধে আমাকে তার সঙ্গে যোগ দিতে খবর পাঠায়। আর আমি যদি না যাই, তাহলে সে খুনজাখ ধ্বংস করে আমাকে খুন করবে।

BanglaBook.org

'আমি যাব না জানিয়ে দিলাম আর বলে দিলাম, তাকেও আমার কাছে আসতে দেব না...'

'তুমি তার সঙ্গে যোগ দিলে না কেন?'

হাজি মুরাদ ভুরু কোঁচকালেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না।

'আমি পারতাম না। আমার ভাই ওসমান আর আবু নুতসাল খানের রক্ত তার হাতে। আমি তার সঙ্গে যোগ দিলাম না। জেনারেল রোসেন আমাকে অফিসার বানিয়ে কমিশন দিলেন এবং আভার শাসন করতে বললেন। সেটা ভালোই ছিল। কিন্তু সেই রোসেনই প্রথমে মোহাম্মদ মির্জা, পরে আহমেদ খানকে কাজি-কুমুখের খান বানালেন। আহমেদ খান আমাকে ঘেন্না করত। সে বেগম সাহেবার মেয়ে সুলতানাকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বেগম সাহেবা দেননি। আহমেদ মনে করত, আমি তা হতে দিইনি...হ্যাঁ, আহমেদ খান আমাকে ঘেন্না করত। আমাকে খুন করতে লোক পাঠিয়েছিল কিন্তু আমি পালিয়ে যাই। তারপর সে আমার বিরুদ্ধে জেনারেল ক্লুগেনুর কান ভারী করে। সে তাকে বলে যে রুশ সৈন্যদের কাঠ না দিতে আমি সবাইকে বলেছি। সে আরও বলে যে আমি এটা পরি (সে পাগড়িতে হাত দিয়ে দেখাল)। তার মানে আমি শামিলের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। জেনারেল তার কথা বিশ্বাস করেননি। আমাকে টোকাও না দিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু জেনারেল তিবলিসে গেলে আহমেদ খান তার ইচ্ছেমতো কাজ করে। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য একদল সৈন্য পাঠায়। আমাকে শিকল দিয়ে কামানের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

'আমাকে ওইভাবে রাখে ছয় দিন,' তিনি বলে চলেন। 'সাত দিনের দিন আমাকে নিয়ে তারা তেমির-খান-শুরার দিকে রওনা হয়। চল্লিশজন সৈন্য। তাদের হাতে গুলিভর্তি বন্দুক। আমার হাত বাঁধা। আমি জানতাম, পালাতে চেষ্টা করলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

'আমরা মানসুহার কাছে পৌঁছালে পথটা খুব সরু হয়ে যায়। ডান দিকে একটা খাদ। প্রায় এক শ বিশ গজ গভীর। আমি ডান দিকে প্রায় কিনারে চলে গেলাম। একজন সৈন্য আমাকে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমি তাকে টেনে সঙ্গে নিয়ে লাফ দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। আর আমি, দেখতেই পাচ্ছ, এখনো বেঁচে আছি।

'পাঁজর, মাথা, হাত, পা সব ভেঙে গিয়েছিল। হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করলাম। মাথা ঘুরে উঠল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলে দেখি সারা শরীর রক্তে ভেজা। একজন রাখাল আমাকে দেখতে পেয়েছিল। সে কিছু লোক জড়ো করে আমাকে একটা গ্রামে নিয়ে গেল। আমার পাঁজর আর মাথা সেরে গিয়েছিল। পা-ও। শুধু একটু খাটো হয়ে গেল,' বলে হাজি মুরাদ তার

BanglaBook.org

খাটো পা'টি মেলে দিলেন। 'এখনো এটা কাজ করে, ওটাই যথেষ্ট।'

'লোকজন খবর পেয়ে আমার কাছে আসতে লাগল। আমি সুস্থ হয়ে তসেলমেসে গেলাম। আভাররা আমাকে আবার তাদের শাসনভার নিতে বলল,' হাজি মুরাদ শান্ত এবং আস্থার সুরে বললেন, 'আমি রাজি হলাম।'

হাজি মুরাদ উঠে দাঁড়িয়ে জিনের থলে থেকে একটা ফোলিও বের করলেন। তার ভেতর থেকে দুটো রংচটা চিঠি বের করে একটা লরিস-মেলিকভের হাতে দিলেন। জেনারেল ক্লুগেনুর লেখা। লরিস-মেলিকভ প্রথম চিঠিটা পড়ল। ওতে লেখা ছিল—

লেফটেন্যান্ট হাজি মুরাদ। তুমি আমার অধীনে কাজ করেছ এবং আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট। তোমাকে ভালো লোক মনে করি।

সম্প্রতি আহমেদ খান আমাকে জানিয়েছে যে তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক, তুমি পাগড়ি নিয়েছ এবং শামিলের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে। তুমি লোকজনকে রুশ সরকারকে অমান্য করার শিক্ষা দিচ্ছ। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করে আমার কাছে আনার আদেশ দিয়েছি। কিন্তু তুমি পালিয়ে গিয়েছ। জানি না এতে তোমার ভালো হবে কি না, যেমন আমি জানি না তুমি দোষী না নির্দোষ।

এখন আমার কথা শোনো। তোমার বিবেক পরিষ্কার থাকলে, তুমি মহান জারের ব্যাপারে দোষী না হলে আমার কাছে এসো। কাউকে ভয় কোরো না। আমি তোমার রক্ষক। খান তোমার কিছুই করতে পারবে না। সে নিজে আমার অধীন, তাই তোমার ভয় করার কিছু নেই।

ক্লুগেনু আরও লিখেছিল যে সে সব সময় তার কথা রাখে এবং ন্যায়বিচার করে, সে আবারও হাজি মুরাদকে তার সামনে হাজির হতে পরামর্শ দেয়।

লরিস-মেলিকভের পড়া শেষ হলে হাজি মুরাদ দ্বিতীয় চিঠিটা দেওয়ার আগে তিনি প্রথমটার কী জবাব দিয়েছিলেন বলেন।

'আমি লিখেছিলাম, আমি শামিলের জন্য পাগড়ি পরি না। আমার আত্মার জন্য, মুক্তির জন্য পরি। আমি শামিলের কাছে যেতে চাই না বা পারিও না। কারণ সে আমার বাবা, আমার ভাই এবং আত্মীয়দের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু আমি রুশদের সঙ্গেও যোগ দিতে পারি না। কারণ, তারা আমার অসম্মান করেছে। (খুনজাখে আমাকে যখন বেঁধে রাখা হয়েছিল, তখন এক হারামজাদা আমার ওপর থুতু ছিটিয়েছিল। ওই লোকটাকে না মারলে আমি আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি না।) তার ওপর আমি মিথ্যুক আহমেদ খানকে ভয় পাই।

'তখন জেনারেল আমাকে এই চিঠিটি লেখেন,' রংচটা দ্বিতীয় চিঠিটি লরিস-মেলিকভের হাতে দিয়ে বললেন হাজি মুরাদ।

BanglaBook.org

'তুমি আমার প্রথম চিঠির জবাব দিয়েছ বলে ধন্যবাদ।' লরিস-মেলিকভ পড়ছিল। 'তুমি লিখেছ, তুমি ফিরে আসতে ভীত নও। কিন্তু একজন অমুসলমান তোমাকে অপমান করায় আসতে পারছ না। কিন্তু আমি আশ্বস্ত করতে পারি, রুশ আইনে ন্যায়বিচার হয়। তুমি দেখতে পাবে তোমার চোখের সামনে অপমানকারীর শাস্তি হবে। আমি এরই মধ্যে ঘটনাটা তদন্তের আদেশ দিয়েছি।

'কথা শোনো, হাজি মুরাদ! আমার কথা এবং আমার ওপর বিশ্বাস না করার জন্য তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ার অধিকার আমার আছে। কিন্তু আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। কারণ, আমি জানি পাহাড়িদের সন্দেহবাতিক কেমন। তোমার বিবেক যদি পরিষ্কার হয় এবং তোমার পাগড়ি পরা যদি আত্মার মুক্তির জন্য হয়, তাহলে তুমি ঠিক। এবং আমার ও রুশ সরকারের দিকে সরাসরি তাকাতে পারবে। যে তোমার অপমান করেছে, তার শাস্তি হবে, কথা দিচ্ছি। তোমার সম্মান তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তুমি দেখবে রুশ আইন কী। তার ওপর আমরা রুশরা সবকিছু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি। কোনো বদমাশ তোমার অপমান করেছে বলে আমাদের কাছে তোমার দাম কমে যায়নি।

'আমি নিজে শিমরিন্তদের পাগড়ি পরার অনুমতি দিয়েছি। আমি তাদের কাজ-কারবার সঠিক দৃষ্টিতে দেখি। তাই আমি আবারও বলছি, তোমার ভয়ের কিছু নেই। যে লোকটার মাধ্যমে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তার সঙ্গে আমার কাছে এসো। সে আমার বিশ্বস্ত এবং তোমার শত্রুদের দাস নয়। সরকারের বিশেষ সুবিধা পায়, এমন একজনের বন্ধু।'

ক্লুগেনু হাজি মুরাদকে তার কাছে যেতে রাজি করানোর জন্য আরও অনেক কিছু লিখেছে।

'আমি তাকে বিশ্বাস করিনি,' লরিস-মেলিকভ পড়া শেষ করলে হাজি মুরাদ বললেন। 'ক্লুগেনুর কাছে যাইনি। আহমেদ খানের ওপর নিজে প্রতিশোধ নেওয়াই আমার কাছে বড় ছিল। রুশদের মাধ্যমে আমি তা করতে পারতাম না। তখন আহমেদ খান তসেলমেস ঘেরাও করে আমাকে ধরতে বা মেরে ফেলতে চায়। আমার তখন গুটিকয় লোক। তাকে ঠেকাতে পারতাম না। ঠিক তখন আমার কাছে একজন দূত এল শামিলের চিঠি নিয়ে। আহমেদ খানকে পরাজিত করে মেরে আমাকে পুরো আভারের শাসনভার দেওয়ার প্রস্তাব। আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করে শামিলের কাছে যাই। তারপর থেকে সব সময় রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি।'

এখানে হাজি মুরাদ যুদ্ধে তার কীর্তিকলাপের বিবরণ দেন, যার অনেক কিছুই লরিস-মেলিকভ জানত। তার সব আক্রমণ ও হামলা উল্লেখযোগ্য ছিল

BanglaBook.org

অসম্ভব দ্রুত চলাচলের জন্য এবং তীব্র আক্রমণের জন্য। তিনি সব সময় জয়ের মুকুট পেয়েছেন।

'আমার ও শামিলের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না,' তার কাহিনি শেষে হাজি মুরাদ বললেন। 'সে আমাকে ভয় পেত এবং আমাকে তার দরকার ছিল। কিন্তু আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো শামিলের পর কে ইমাম হবে, তখনই ঘটনাটা ঘটল। আমি জবাব দিলাম, "যার তলোয়ারে সবচেয়ে বেশি ধার, সে ইমাম হবে!"

'কথাটা শামিলের কানে তোলা হয়েছিল এবং সে আমাকে বাদ দিতে চেয়েছিল। সে আমাকে তাসবাসারানে পাঠায়। আমি গিয়ে এক হাজার ভেড়া এবং তিন শ ঘোড়া দখল করলাম। কিন্তু সে বলল আমি ঠিক কাজ করিনি এবং আমাকে নায়েবের পদ থেকে বরখাস্ত করল। সব টাকা তাকে পাঠানোর আদেশ দিল। আমি এক হাজার সোনার মুদ্রা পাঠালাম। সে তার মুরিদদের পাঠিয়ে আমার সব সম্পত্তি নিয়ে গেল। তার কাছে যেতে আদেশ করল। জানতাম আমাকে মেরে ফেলবে, তাই আমি যাইনি। তারপর সে আমাকে ধরে নিতে পাঠাল। আমি বাধা দিয়ে ভরন্তসভের কাছে গেলাম। আমি পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাইনি। আমার মা, স্ত্রী এবং ছেলে তার হাতে। সরদারকে বলো, আমার পরিবার শামিলের হাতে থাকলে আমি কিছু করতে পারব না।'

'আমি তাকে বলব,' লরিস-মেলিকভ বলল।

'কষ্ট হলেও চেষ্টা কোরো! আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার। শুধু প্রিন্সের কাছে আমার পক্ষে বলে আমাকে সাহায্য করো! আমি বাঁধা পড়ে আছি, আর দড়ির অন্য দিক শামিলের হাতে,' তার কাহিনি শেষ করে বললেন হাজি মুরাদ।

১৪

২০ ডিসেম্বর ভরন্তসভ সমর বিভাগের মন্ত্রী চেরনিসভকে নিচের চিঠিটি লেখেন। চিঠিটি ফরাসি ভাষায় লেখা ছিল :

'প্রিয় প্রিন্স, গত ডাকে আপনাকে চিঠি লিখিনি, কারণ, হাজি মুরাদকে নিয়ে আমরা কী করতে পারি, আমি প্রথমে সে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলাম। তা ছাড়া গত দু-তিন দিন আমি খুব সুস্থ ছিলাম না।

'আগের চিঠিতে হাজি মুরাদের এখানে আসার খবর আপনাকে

BanglaBook.org

জানিয়েছি। সে আট তারিখে তিবলিসে আসে। আমার সঙ্গে দেখা হয় তার পরের দিন। পরের সাত-আট দিনে আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। ভেবেছি আমরা ভবিষ্যতে তাকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। বিশেষ করে এখন আমরা তাকে নিয়ে কী করব। সে তার পরিবারের ভাগ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। প্রতিবারই সে খোলাখুলি বলেছে তারা শামিলের হাতে থাকলে তার নড়ার শক্তি নেই এবং আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাকে যে যত্ন করা হচ্ছে বা ক্ষমা করা হচ্ছে, তার জন্যও সে কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারছে না।

'প্রিয় মানুষদের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা তাকে অসুস্থ করে ফেলছে। তার কাজ করার জন্য যাদের লাগিয়েছি, তারা আমাকে বলেছে সে রাতে ঘুমায় না। খায় খুব কম আর সারাক্ষণ নামাজ পড়ে। সব সময় কিছু কসাক নিয়ে বের হওয়ার অনুমতি চায়। এটাই তার একমাত্র বিনোদন এবং কায়িক শ্রম হতে পারে। সারা জীবনের অভ্যাস বলে সেটা তার প্রয়োজন। প্রতিদিন সে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে তার পরিবারের কোনো খবর আছে কি না। শামিলকে আমাদের হাতে বন্দীদের বিনিময়ে তার পরিবারকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাতে বলে। সে কিছু টাকাও দিতে চায়। সে জন্য তাকে টাকা দেওয়ার মতো লোক আছে। সে সব সময় আমাকে বলে, "আমার পরিবারকে বাঁচান এবং আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন (তার মতে সে ভালো হবে লেসঘিয়ান রেখায়), আর এক মাসের মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কাজে না আসি, তাহলে আপনাদের যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন।" আমি বলেছি, এগুলো আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু তার পরিবার পাহাড়ি এলাকায় থাকলে এবং আমাদের হাতে পণবন্দী না থাকলে আমাদের মধ্যে অনেকেই তাকে বিশ্বাস করবে না। আরও বলেছি, আমাদের সীমান্তে সব বন্দীকে এক জায়গায় আনার জন্য সম্ভব সবকিছু করছি। তার পরিবারের মুক্তিপণ হিসেবে সে যা জোগাড় করতে পারবে, তার সঙ্গে যোগ করার জন্য আমাদের আইনে আমি তাকে টাকা দিতে পারব না। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য হয়তো অন্য কোনো উপায় বের করা যেতে পারে। তারপর আমি তাকে খোলাখুলি বলেছি যে আমার মতে শামিল তার পরিবারকে কোনোভাবেই ছাড়বে না। বরং শামিল তাকে ক্ষমা করে তার আগের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে। আর হাজি মুরাদ ফিরে না গেলে তার মা, স্ত্রী ও ছয় সন্তানকে মেরে ফেলার হুমকি দিতে পারে। আমি তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করেছি শামিলের কাছ থেকে এমন ঘোষণা এলে সে কী করবে। হাজি মুরাদ তার চোখ এবং হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে বলেছে, সবই আল্লাহর হাতে। কিন্তু সে কখনো শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কারণ, সে নিশ্চিত জানে, শামিল তাকে ক্ষমা করবে না। তাই সে বেশি দিন

BanglaBook.org

বেঁচে থাকতে পারবে না। তার পরিবারকে মেরে ফেলার ব্যাপারে তার মন্তব্য শামিল হয়তো অতটা বোকা হবে না। কারণ, প্রথমত, সে চাইবে না হাজি মুরাদ আরও মরিয়া ও বিপজ্জনক শত্রু হোক। দ্বিতীয়ত, দাগেস্তানে অনেকে, অনেক প্রভাবশালী লোক আছে, যারা শামিলকে ওই রকম কাজে বিরত করবে। সবশেষে সে কয়েকবার বলেছে আল্লাহ তার জন্য ভবিষ্যতে যা-ই রেখে থাকুন না কেন, এখন সে তার পরিবারের মুক্তি ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহী নয়। সে আমাকে আল্লাহর নামে তাকে সাহায্য করার এবং তাকে চেচনিয়ার কাছাকাছি যেতে অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করেছে। সেখান থেকে আমাদের কমান্ডারদের অনুমতি ও সাহায্য নিয়ে সে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ও নিয়মিত খবর পেতে চায়। তাদের উদ্ধার করার সবচেয়ে ভালো উপায় কী, বের করতে চায়। সে বলেছে, ওই এলাকার কিছু লোক, এমনকি কিছু নায়েব তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে ঘনিষ্ঠ এবং ওই এলাকায় রাশিয়ার অধীন অথবা নিরপেক্ষ লোকদের মধ্য থেকে আমাদের সাহায্য নিয়ে সে সম্পর্ক করতে পারবে, যা তার স্বপ্ন সফল করতে কাজে লাগবে। যে স্বপ্ন তার দিনরাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সে সফল হলে সহজে আমাদের উপকারের জন্য কাজ করতে পারবে এবং আমাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে।

'সে চাচ্ছে তাকে বিশ-ত্রিশজন বাছাই করা কসাকের পাহারায় গ্রজনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কসাকরা তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা এবং আমাদের বিশ্বস্ত রাখার নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করবে।'

'প্রিয় প্রিন্স, আপনি বুঝতে পারছেন এসব কারণে আমি কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। কারণ, আমার ওপর দায়িত্ব অনেক। তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা হবে হঠকারিতা। তার পালানোর সব পথ বন্ধ করতে হলে আটক রাখতে হবে। আমার মতে, তা অন্যায় হবে এবং কৌশলেও ভুল হবে। ওই রকম ঘটনার খবর খুব তাড়াতাড়ি পুরো দাগেস্তানে ছড়িয়ে পড়িবে। তাতে যারা কমবেশি প্রকাশ্যে শামিলের বিরোধিতা করতে চাচ্ছে (সংখ্যায় তারা অনেক) বা যারা ইমামের সবচেয়ে সাহসী ও ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নায়েব, তারা হাজি মুরাদ আমাদের কাছে আসার পর তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের ওপর লক্ষ রাখছে এবং তাদের পিছিয়ে রাখলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে। আমরা হাজি মুরাদকে একজন বন্দী হিসেবে রাখলে পরিস্থিতির সবচেয়ে ভালো ফল হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই আমি মনে করি, আমি যা করেছি, তার চেয়ে ভিন্ন কিছু করা যেত না। একই সঙ্গে আমি মনে করি হাজি মুরাদ আবার পালানোর কথা মাথায় আনলে আমাকেই বিরাট ভুলের জন্য দায়ী করা হবে। এই চাকরিতে এবং বিশেষ করে এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে কোনো ঝুঁকি, ভুল

BanglaBook.org

বা দায়িত্ব ছাড়া কোনো সহজ উপায় পাওয়া অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন। কিন্তু একবার সঠিক মনে করে কোনো পথ ধরলে তা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।

'প্রিয় প্রিন্স, এই বিষয়টি মহামহিম সম্রাটের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করতে আপনাকে অনুরোধ করছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সম্রাটকে আমার পদক্ষেপ সন্তুষ্ট করলে আমি খুব খুশি হব।

'আমি ওপরে যা লিখেছি, তা জেনারেল জাভোদভস্কি এবং জেনারেল কজলোভস্কিকেও লিখেছি, যা থেকে পরের জন হাজি মুরাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপের নির্দেশনা পেতে পারেন। আমি হাজি মুরাদকে কজলোভস্কির অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করতে বা কোথাও যেতে নিষেধ করেছি। আমি তাকে আমাদের সেনাদলের সঙ্গে বের হতে বলেছি। তা না হলে তাকে আটক করা হয়েছে, শামিল এমন গুজব রটাতে পারে। একই সঙ্গে আমি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি যে সে ভজভিঝেনস্কে যাবে না। কারণ, সে আমার ছেলের কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ করে তাকে বন্ধু বানিয়েছে কিন্তু আমার ছেলে সেখানকার কমান্ডার নয় এবং সহজেই ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। যা-ই হোক, ভজভিঝেনস্ক ঘন জনবসতির শত্রুভাবাপন্ন এলাকার বেশি কাছে এবং সে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যা চায়, তার জন্য গ্রজনিই সব দিক থেকে উপযুক্ত।

'তার অনুরোধে বিশজন কসাককে দেওয়ার পরও তার সঙ্গে ক্যাপ্টেন লরিস-মেলিকভকে দিয়েছি। সে একজন চমৎকার অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসার। সে তাতার বলতে পারে এবং হাজি মুরাদকেও ভালো করে জানে। হাজি মুরাদও তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে বলে মনে হয়। হাজি মুরাদ দশ দিন এখানে থাকার সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রিন্স তারখানভের সঙ্গে একই বাড়িতে ছিল। তারখানভ সুশিন জেলার কমান্ডার এবং সার্ভিসের কাজে এখানে আছে। সে সত্যি একজন যোগ্য লোক, তার ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। সে-ও হাজি মুরাদের আস্থা অর্জন করেছে। সে খাঁটি তাতার জানে বলে তার মাধ্যমেই আমরা গোপন ও খুঁটিনাটি বিষয় আলাপ করেছি। আমি হাজি মুরাদের বিষয়ে তারখানভের সঙ্গে আলাপ করেছি। সে-ও একমত যে আমি যা করেছি, সেটাই করা দরকার ছিল অথবা হাজি মুরাদকে জেলে ঢুকিয়ে কড়া পাহারায় রাখতে হতো। (কারণ একবার তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তাকে আটকে রাখা সহজ হতো না), আর তা না হলে তাকে দেশ থেকে বের করে দিতে হতো। কিন্তু পরের দুটোর যেকোনো একটা করলে শামিলের সঙ্গে হাজি মুরাদের ঝগড়ার ফলে আমরা যা সুবিধা পাচ্ছি, তা নষ্ট হয়ে যেত। আর ভবিষ্যতে শামিলের বিরুদ্ধে লোকের বিদ্রোহ

BanglaBook.org

বন্ধ হয়ে যেত। প্রিন্স তারখানভ আমাকে বলেছেন যে তার মনে হাজি মুরাদের সত্যবাদিতা নিয়ে সন্দেহ নেই এবং শামিল তাকে ক্ষমা করবে না এবং ক্ষমা করার ওয়াদা না করে মেরে ফেলবে, হাজি মুরাদের এমন বিশ্বাসের ব্যাপারেও তারখানভের নিজের কোনো সন্দেহ নেই। হাজি মুরাদের সঙ্গে মেশার সময় একমাত্র যে বিষয়টি উদ্বেগের বলে তার নজরে এসেছে, তা হলো হাজি মুরাদের ধর্মভক্তি। তারখানভ মানেন যে শামিল হয়তো সেদিক দিয়ে তার ওপর প্রভাব খাটাতে পারে। কিন্তু আমি আগেই যেমন বলেছি, শামিল হাজি মুরাদকে জীবনে তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য রাজি করাতে পারবে না।

'প্রিয় প্রিন্স, আমাদের এখানকার বিষয়ে আপনাকে এটাই জানানোর ছিল।'

১৫

তিবলিস থেকে প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছিল ১৮৫১ সালের ২৪ ডিসেম্বর। বারোটি ঘোড়াকে হয়রান করে এবং আরও বারোটিকে রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত পিটিয়ে একজন বার্তাবাহক নববর্ষের আগের সন্ধ্যায় সেটা প্রিন্স চেরনিশভের কাছে পৌঁছোয়। তিনি তখন সমর বিভাগের মন্ত্রী। ১ জানুয়ারি ১৮৫২ তারিখে চেরনিশভ অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে ভরন্তসভের চিঠিটাও সম্রাট নিকোলাসের কাছে নিয়ে গেলেন।

চেরনিশভ ভরন্তসভকে অপছন্দ করতেন। কারণ, সবাই ভরন্তসভকে শ্রদ্ধা করত। আরও কারণ, ভরন্তসভের প্রচুর সম্পত্তি এবং তিনি ছিলেন আসলেই অভিজাত। অন্যদিকে চেরনিশভ দরিদ্র অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। কিন্তু বিশেষ কারণটা ছিল ভরন্তসভের প্রতি সম্রাটের দুর্বলতা। তাই চেরনিশভ যেকোনো সুযোগে ভরন্তসভের ক্ষতি করার চেষ্টা করতেন।

ককেশাস সম্বন্ধে আগের প্রতিবেদনটা দেওয়ার সময় তিনি ভরন্তসভের বিরুদ্ধে সম্রাটের অসন্তোষ জাগাতে সফল হয়েছিলেন। কারণ, সেনাপতিদের বেখেয়ালের জন্য ছোট একটা ককেশীয় সৈন্যদলকে পাহাড়িরা খতম করে দেয়। চেরনিশভ এখন হাজি মুরাদের ব্যাপারে ভরন্তসভ যা করেছে, সেগুলো দিয়ে কান ভারী করতে চাইছেন। তিনি সম্রাটকে বলতে যাচ্ছেন যে ভরন্তসভ সব সময় রুশদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের রক্ষা করে আর সুবিধা দেয়। এবার সে

BanglaBook.org

হাজি মুরাদকে ককেশাসে থাকতে দিয়ে অবিজ্ঞের মতো কাজ করেছে। কারণ, সে আমাদের প্রতিরক্ষার বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে বলে সন্দেহ করা যায়। তাই ভালো হবে তাকে মধ্য রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিলে। তার পরিবারকে পাহাড়িদের কাছ থেকে উদ্ধার করে তার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে কাজে লাগানো যাবে।

চেরনিশভের পরিকল্পনা সফল হলো না। একমাত্র কারণ, নববর্ষের দিনে সম্রাট নিকোলাসের মেজাজ বিশেষ খারাপ ছিল। ওই বিকারের সময় কোনো রকম পরামর্শ গ্রহণ করার কথা নয়। চেরনিশভের পরামর্শ তো একদমই না। তাকে বাদ দিতে পারছেন না বলেই এখন তাকে সহ্য করছেন নিকোলাস। তাকে তিনি নীতিহীন লোক মনে করেন। নিকোলাসের সিংহাসনে আরোহণের সময় সংবিধানের জন্য 'ডিসেম্বর' ষড়যন্ত্রীদের বিচারকালে চেরনিশভ যাচারি চেরনিশভের শাস্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন আর তার সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালান। তাই নিকোলাসের বদমেজাজকে সাধুবাদ, হাজি মুরাদ ককেশাসেই রয়ে গেলেন। তার অবস্থাও বদলাল না, চেরনিশভ অন্য কোনো সময় প্রস্তাবটি তুললে যা হতে পারত।

তাপমাপকে মাত্রা শূন্যের নিচে, ১৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সাড়ে নয়টায় চেরনিশভের দাড়িওয়ালা গাড়োয়ান শীতসকালে কুয়াশার মধ্য দিয়ে ছোট স্লেজটাকে চালিয়ে আনল। ওটা নিকোলাসের স্লেজটার মতোই। ছোট একটা বাক্সে সে বসে ছিল মোটা শরীর নিয়ে। মাথার ওপরে চোখা কুশন আকারের উজ্জ্বল নীল মখমলের টুপি। উইন্টার প্যালেসের ফটক দিয়ে গাড়িটি ঢুকিয়ে তার দোস্ত প্রিন্স দলগরুকির গাড়োয়ানকে ঘাড় নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। সে-ও তার কর্তাকে নিয়ে প্রাসাদে এসেছে। পুরু কাপড় লাগিয়ে প্রায় পিণ্ড বানানো বিশাল কোটের মধ্যে সে বাইরে বসে আছে অনেকক্ষণ। গাড়োয়ানের আসনে বসে জমে যাওয়া হাতগুলো ঘষে ঘষে গরম করছে। চেরনিশভ পরেছিলেন বড় একটা চাদর—রুপালি বিভারের (উদবিড়ালের মতো দেখতে চ্যাপ্টা লেজের লোমশ প্রাণী) পশমি গলাবন্ধ, মাথায় আইনমাফিক মোরগের পালক লাগানো তিন কোনা টুপি। স্লেজে ভালুকের চামড়ার পর্দাটি ওপরের দিকে উঠিয়ে তিনি সাবধানে ঠান্ডা পাগুলো বের করে আনলেন। জুতার ওপরে কোনো গলোশ (জুতাসহ পরার রাবারের পানিরোধক) পরেননি তিনি। কখনোই এই বুটগুলো পরেন না বলে তার অহংকার। তাকে সম্মান দেখিয়ে দারোয়ান দরজা খুলে ধরেছিল। জুতার নালে ঠংঠং আওয়াজ করে তিনি ঢুকলেন। ভারী চাদরটা খুলতেই একজন খানসামা তা নিয়ে নিল। চেরনিশভ আয়নার কাছে গিয়ে কোঁকড়া পরচুলার ওপর থেকে সাবধানে টুপিটা

BanglaBook.org

খুললেন। আয়নায় নিজেকে দেখে কপাল ও দুপাশ থেকে চুলের গোছাগুলো সরালেন পাকা হাতে। ঠিক করে নিলেন ক্রস, কাঁধে ঝোলানো সোনালি দরা (শোল্ডার-নট) এবং পদমর্যাদার বিহ্নগুলো। তারপর বয়স্ক নড়বড়ে পায়ের ওপর ভর করে গালিচামোড়া ছোট ছোট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। দর্শনার্থীদের ঘরের আজ্ঞাবহ খানসামা মাথা নুয়ে অভিবাদন জানাল। চেরনিশভ তাকে পার হয়ে ঢুকলেন ঘরের ভেতর। সম্রাটের এডিসি নতুন। মুখে তার তাজা গোলাপি আভা, চিকন গোঁফ আর জুলফিগুলো চোখের দিকে নামানো। নিকোলাসের কায়দায়। ঝকঝকে নতুন বিহ্ন, দরা ও পোশাক পরা এডিসি তাকে সসম্মানে বরণ করল।

প্রিন্স ভাসিলি দলগোরুকি সহকারী সমরমন্ত্রী। তার নীরস চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। ছুঁচালো গোঁফ আর নিকোলাসের কায়দায় তার জুলফিও চোখের দিকে টানা। প্রিন্স ভাসিলি তাকে স্বাগত জানালেন।

'সম্রাট কি আছেন!' মন্ত্রিসভার দরজার দিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকিয়ে চেরনিশভ এডিসিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মহামহিম কেবলই ফিরে এসেছেন,' এডিসি জবাব দিল। তার চলাফেরা এত কোমল যে মাথার ওপর এক গ্লাস পানি রেখে দিলে তার এক ফোঁটাও যেন ছলকে পড়বে না। শরীরের ভঙ্গি গভীর ভক্তি দেখানোর মতো করে সে এগোল নিঃশব্দ দরজার দিকে।

দলগোরুকি ইতিমধ্যে তার ব্যাগ খুলে দেখে নিয়েছে, দরকারি সব কাগজ আনা হয়েছে কি না। আর চেরনিশভ জমে যাওয়া পায়ে রক্তসঞ্চালন ফিরিয়ে আনতে পায়চারি করছেন আর আউড়ে নিচ্ছেন সম্রাটকে কী বলবেন। তিনি যখন মন্ত্রিসভার দরজার কাছে, ঠিক তখন সেটা আবার খুলে গেল। এডিসি আগের চেয়েও বেশি ভক্তিভরে বের হয়ে মন্ত্রী এবং তার সহকারীকে ভেতরে ঢোকার ইশারা করল।

বিগত শতকে এক ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর উইন্টার প্যালেস আবার বানানো হয়েছিল। কিন্তু নিকোলাস ওপরতলার ঘরগুলোই ব্যবহার করতেন। চমৎকারভাবে সাজানো মন্ত্রিসভার একটি ঘরে তিনি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থদের প্রতিবেদন গ্রহণ করতেন। ঘরটিতে চারটি বড় বড় জানালা। সামনের দেয়ালে সম্রাট প্রথম আলেকজান্ডারের একটা বিরাট আবক্ষ তেলচিত্র। জানালাগুলোর মাঝখানে দেরাজওয়ালা দুটো দাপ্তরিক টেবিল। দেয়ালের পাশে কয়েকটি চেয়ার। ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা লেখার টেবিল। তার সামনে নিকোলাসের জন্য একটা আরামকেদারা আর অন্য চেয়ারগুলো আগতদের জন্য, যাদের কথা শোনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নিকোলাস বসেছিলেন কালো কোট পরে। কাঁধের ফিতেগুলো আছে

BanglaBook.org

কিন্তু বিহ্বলগুলো নেই ওতে। তার বিশাল বপুটি চেয়ারের পেছনে হেলানো। অতিকায় ফুলে ওঠা পেটটা কারুকাজ করা ফিতে দিয়ে শক্ত করা বাঁধা। দৃষ্টি আগতদের দিকে স্থির নিবদ্ধ—চোখ প্রাণহীন। সামনের দিকে আঁচড়ানো টিকে থাকা চুলের গোছা এবং টাকঢাকা পরচুলার মাঝের জায়গাটুকুতে কপাল ক্রমেই পিছিয়ে চলেছে। তার লম্বা, ফ্যাকাশে চেহারা সেদিন বিশেষ শীতল ও নিষ্প্রাণ। তার চিরনিষ্প্রভ চোখ আরও অনুজ্জ্বল। ওপরের দিকে ঘোরানো গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটো চাপা। সসেজ আকারের দুটো গোঁফের ডগা রাখা হয়েছে সদ্য কামানো মোটা গালের ওপর। উঁচু কলার সে দুটোকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। মুখের ওপর ঠাসা চিবুকটিও চেহারায় অসন্তোষ ও বিরক্তির ছাপটিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তার বিরক্তির কারণ তিনি ক্লান্ত। ক্লান্তির কারণ আগের রাতে তিনি অভ্যাসমতো অশ্বারোহী সৈন্যের ছদ্মবেশে মুখোশ পরার আসরে (মাসকারেড) গিয়েছিলেন। সবাই তার বিশাল দেহটির জন্য জায়গা করে দিচ্ছিল। আগের আসরে একটি মুখোশ তার গায়ের রং, চমৎকার শরীর আর মধুর কণ্ঠে তার (নি) জরাগ্রস্ত যৌন ক্ষুধাকে জাগিয়ে তুলেছিল। পরের আসরেও আসবে কথা দিয়ে সেবার সে চলে যায়।

গত রাতে সেই মুখোশ তার কাছে এসেছিল। তিনি তাকে আর যেতে দেননি। একা সময় কাটানোর জন্য সাজানো কুঠরির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। চুপিসারে সেখানে গিয়ে সেখানকার পরিচারককে পেলেন না। নিকোলাস নিজ হাতে দরজা খুলে মহিলাকে আগে ঢুকতে দিলেন।

'এখানে বোধ হয় কেউ আছে!' ঢুকতেই থেমে গিয়ে মুখোশ-মহিলা ফরাসিতে বললেন।

কুঠরিতে আসলেই লোক ছিল। মখমলে মোড়া ছোট সোফাটায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ছিল বর্শাধারী বাহিনীর একজন অফিসার এবং ঘোমটাওয়ালা আলখাল্লা পরা কোঁকড়া চুলের এক সুন্দরী। মেয়েটি মুখোশ খুলে রেখেছিল, ক্রুদ্ধ নিকোলাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সে মুখোশ দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলল। ভয়ে পাথর হয়ে অফিসারটি সোফা থেকে উঠতেই পারল না। শুধু কাতর চোখে তাকিয়ে থাকল নিকোলাসের দিকে।

লোকের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করায় অভ্যস্ত নিকোলাস সেটা উপভোগ করতেন এবং কোনো কোনো সময় ভয়ে চুপসে যাওয়া লোকদের দয়া দেখিয়ে তিনি তাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে মজা পেতেন। এবারে তিনি তা-ই করলেন।

ভীতবিহ্বল অফিসারটিকে বললেন, 'বেশ বন্ধু! তুমি আমার চেয়ে ছোট, তাই তোমার জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিতে পারো।'

BanglaBook.org

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অফিসারটি। প্রথমে ফ্যাকাশে, তারপর লাল হয়ে প্রায় দ্বিগুণ কুঁজো হয়ে নীরবে সঙ্গিনীর অনুসরণ করল। নিকোলাস মহিলাকে নিয়ে একা হলেন।

বোঝা গেল, সুন্দরী সঙ্গিনী একজন সুইডিশ গৃহশিক্ষিকার বছর বিশেকের কুমারী মেয়ে। সে বলল কেমন করে বাচ্চা থাকতেই নিকোলাসের ছবি দেখে তার প্রেমে পড়ে। কত গভীরভাবে তাকে চেয়েছে এবং যেকোনো উপায়ে তার চোখে পড়বে বলে ঠিক করে। এখন সে সফল, তার আর কিছুই চাই না।

নিকোলাস যেখানে মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, মেয়েটিকে প্রাসাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে নিকোলাস তার সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশি সময় কাটালেন।

সে রাতে ঘরে ফিরে নিকোলাস তার শক্ত সরু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বিছানাটি নিয়ে তার অনেক গর্ব এবং গায়ে যে চাদরটি টেনে নিলেন, তিনি মনে করতেন (এবং বলতেন), সেটা নেপোলিয়নের টুপির চেয়ে বিখ্যাত। ঘুমিয়ে পরতে তার অনেক সময় লাগল। তার চোখে একবার ভাসছিল মেয়েটির সুন্দর মুখে শঙ্কামেশানো আনন্দের অভিব্যক্তি, আবার তার নিয়মিত রক্ষিতা নেলিদোভার চওড়া কাঁধ। তিনি দুটোর তুলনা করছিলেন। বিবাহিত পুরুষদের লাম্পট্য খারাপ জিনিস, কথাটি একবারও তার মাথায় আসেনি। কেউ এ জন্য অনুযোগ করলে তিনি খুবই বিস্মিত হতেন। তিনি যথার্থ কাজ করেছেন, এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হলেও কিন্তু অস্বস্তি একটা রয়েই গেল। এই অনুভূতিটার গলা টিপে মারতে যে জিনিসটা তাকে শান্ত করে, তিনি তা-ই করলেন—নিজ মহিমার কথা ভাবলেন।

অনেক দেরি করে ঘুমালেও তিনি আটটার আগেই উঠে পড়েছিলেন। প্রক্ষালনের কাজ সেরে অভ্যাসমতো তার বিশাল শরীরে বরফ ঘষলেন। প্রার্থনা করলেন (ছোটবেলা থেকে না বুঝে যে প্রার্থনা করে আসছেন তা-ই, প্রথমে যিশুমাতা, পরে যিশু ও সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা)। তারপর তার সামরিক চাদর এবং টুপি পরে প্রাসাদের ছোট গাড়িবারান্দাটি দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন বাঁধের কাছে।

বাঁধে আইনশাস্ত্রের কলেজের পোশাক পরা তার মতোই হোঁতকা এক ছাত্রের দেখা পেলেন। পোশাকটি চিনতে পেরে ভুরু কুঁচকালেন তিনি। মুক্তচিন্তা করে বলে কলেজটি তার অপছন্দ। কিন্তু ছেলেটির স্বাস্থ্য এবং যত কষ্টে ছেলেটি নিজেকে সোজা রেখে দর্পভরে তাকে স্যালুট ঠুকল, তাতে নিকোলাস নরম হলেন।

'তোমার নাম কী?'

'পোলসাতভ, মহামহিম।'

BanglaBook.org

'বেশ!'

ছেলেটি তার হাত টুপি পর্যন্ত তুলে রেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

নিকোলাস থামলেন।

'তুমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাও?'

'মোটেই না, মহামহিম।'

'বোকা!' নিকোলাস ঘুরে নিজের পথে চলতে শুরু করলেন। যে কথাগুলো তার মাথায় আসছিল, তা-ই উচ্চারণ করছিলেন।

'কোপারভাইন...কোপারভাইন,' বললেন বেশ কয়েকবার, গত রাতের মেয়েটির নাম। 'জঘন্য...জঘন্য,' যা বলছিলেন ভেবে বলেননি। কিন্তু তা শুনে তার অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমাকে ছাড়া রাশিয়া চলবে কী করে?' তিনি বললেন, 'আগের অসন্তোষের অনুভূতিটা ফিরে আসছিল। 'হ্যাঁ, শুধু রাশিয়া কেন, আমি না থাকলে পুরো ইউরোপের কী হবে?' তার ভগ্নিপতি প্রুশিয়ার রাজার দুর্বলতা ও বোকামির কথা ভেবে তিনি মাথা নাড়লেন।

ছোট গাড়িবারান্দাটার দিকে ফিরে আসার পথে তিনি দেখতে পেলেন, হেলেনা পাভলোভনার গাড়িটা প্রাসাদের সাল্টিকভ ফটক দিয়ে ঢুকছে। সঙ্গে একজন লাল উর্দিপরা ভৃত্য।

তার কাছে হেলেনা পাভলোভনা অকর্মা লোকদের প্রতিভূ। এরা শুধু বিজ্ঞান ও কবিতা নিয়েই নয়, মানুষকে কীভাবে শাসন করতে হবে, সেটা নিয়েও আলোচনা করে। যেন নিকোলাস যেভাবে শাসন করছে, তারা তার চেয়ে ভালো শাসন করতে পারবে। তিনি জানতেন, এ ধরনের লোকদের তিনি যতই দমিয়ে রাখেন না কেন, তারা বারবার সে কাজ করতে থাকে। তার ভাই মাইকেল পাভলোভিচের কথা মনে হলো নিকোলাসের। মারা গেছে খুব বেশি দিন হয়নি। বিরক্তি ও ব্যথায় তার মনটা ভরে গেল। ভুরু দুটো গভীরভাবে কুঁচকে তিনি ফিসফিস করে আবার মাথায় যা আসে, সেই শব্দগুলো আওড়াতে থাকলেন। প্রাসাদে ঢোকা পর্যন্ত তিনি তা করতে থাকলেন।

নিজের ঘরে ঢুকে তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফের মাথা দুটো চোখা করে ঠেলে দিলেন ওপরের দিকে। কপালের ধূসর চুলের গোছা আর টাকঢাকা পরচুলাটা ঠিক করলেন। তারপর সোজা চলে গেলেন প্রতিবেদন গ্রহণের ঘরটায়।

তিনি প্রথমেই ডাকলেন চেরনিশভকে। ঘরে ঢুকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিকোলাসের মেজাজ আজ খুব খারাপ। গত রাতের ঘটনা জানতেন বলে কারণটা বুঝতে পেরেছিলেন। শীতল অভ্যর্থনা জানিয়ে চেরনিশভকে বসতে বলে নিকোলাস তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চেরনিশভ

BanglaBook.org

প্রথমে তুললেন রসদ বিভাগের কর্মকর্তাদের তহবিল তছরুপের সর্বশেষ ঘটনা; পরেরটা ছিল প্রুশিয়ায় সেনা মোতায়েনের বিষয়। তার পরেরটা নববর্ষের পুরস্কারের তালিকায় বাদ পড়া লোকদের নাম। তারপর তুললেন হাজি মুরাদের বিষয়ে ভরন্তসভের প্রতিবেদন। সবশেষে একাডেমি অব মেডিসিনের একজন শিক্ষককে এক ছাত্রের হত্যাচেষ্টার কিছু খুঁটিনাটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ।

নিকোলাস নিঃশব্দে ঠোঁট দুটো চেপে রেখে তহবিল তছরুপের ঘটনা শুনছিলেন আর বিশাল সাদা হাতের আংটি পরা আঙুলটি দিয়ে কাগজের ওপর টোকা দিচ্ছিলেন। চোখ দুটো আটকে ছিল চেরনিশভের কপাল ও তার ওপরে চুলের গোছাটার দিকে।

নিকোলাস বিশ্বাস করতেন, সবাই চুরি করে। তিনি জানতেন, রসদ বিভাগের কর্মকর্তাদের শাস্তি দিতে হবে। তাই সবাইকে পদাবনতির আদেশ দিলেন। তিনি জানতেন, তাদের জায়গায় যারা উঠে এল, তারাও সে কাজটিতে বিরত থাকবে না। চুরি করা ছিল কর্মকর্তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার কাজ তাদের শাস্তি দেওয়া। এ কাজে ক্লান্ত হয়ে গেলেও তিনি ভালোভাবেই তা করছিলেন।

'মনে হচ্ছে রাশিয়ায় মাত্র একজন লোক সৎ!' তিনি বললেন।

চেরনিশভ সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন সে লোকটি নিকোলাস নিজে, তাই সম্মতি দিতে মৃদু হাসলেন।

'তাই মনে হয়, মহামহিম।'

'এগুলো রেখে দিন, আমি পরে দেখব,' বলে টেবিলের বাঁ দিকে কাগজগুলো রাখলেন।

তারপর চেরনিশভ পুরস্কার দেওয়ার আর প্রুশিয়ায় সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর বিষয়টি তুললেন।

নিকোলাস তালিকাটির ওপর চোখ বুলিয়ে কয়েকটি নাম কেটে দিলেন। আর সংক্ষেপে প্রুশিয়ার সীমান্তে দুই ডিভিশন সৈন্য পাঠানোর আদেশ দিলেন। ১৮৪৮ সালের ঘটনার পর দেশের মানুষকে সংবিধান দেওয়ার জন্য নিকোলাস প্রুশিয়ার রাজাকে ক্ষমা করতে পারেননি। চিঠি ও আলোচনায় আত্মীয়ের সঙ্গে (শ্যালক) সহৃদয়ভাব দেখালেও সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যদি দরকার হয়। প্রুশিয়ার মানুষ বিদ্রোহ করলে তার আত্মীয়ের সিংহাসন রক্ষায় সে সৈন্যদের তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। (নিকোলাস সবখানেই বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখতেন।) কয়েক বছর আগে যেমন হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমাতে তিনি সৈন্যদের লাগিয়েছিলেন। প্রুশিয়ার রাজাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব বাড়ানোও সৈন্য পাঠানোর

BanglaBook.org

আরেক কারণ।

'হ্যাঁ, আমি না থাকলে রাশিয়া এখন কী করত,' আবার তিনি ভাবলেন।

'বেশ, আর কী আছে?'

'ককেশাস থেকে পাঠানো একটি বার্তা,' বলে চেরনিশভ হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে ভরন্তসভ যা লিখেছিলেন, তা জানালেন।

'হায় খোদা!' বললেন নিকোলাস। 'যাক, শুরুটা ভালোই হয়েছে!'

'মহামহিম যা পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কাজে দিচ্ছে বলেই প্রমাণিত হলো,' চেরনিশভ বলল।

তার কৌশল ঠিক করার প্রতিভার স্বীকৃতি নিকোলাসের জন্য সুমধুর ছিল। তিনি এই প্রতিভা নিয়ে গর্ব করতেন। কিন্তু মনের গহনে তিনি জানতেন, ওই রকম কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব নেই এবং এখন তিনি তার প্রতিভার প্রশস্তি আরও শুনতে চাচ্ছেন।

'কী বলতে চাচ্ছেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মনে করছি, মহামহিম, আপনার পরিকল্পনা যদি অনেক আগে থেকে কাজে লাগিয়ে আমরা ধীরস্থিরভাবে বন-জঙ্গল কেটে ফেলতাম আর খাবার পৌছানোর পথ বন্ধ করে দিতাম, তাহলে ককেশাস অনেক আগেই বশ্যতা স্বীকার করত। হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণ থেকে আমি মনে করছি, তারা আর টিকতে পারছে না।'

'ঠিক,' বললেন নিকোলাস।

অবশ্য বন কেটে আর খাবার পৌছানোর পথ বন্ধ করে শত্রুর এলাকায় ধীরে ধীরে এগোনোর পরিকল্পনাটি ছিল এরমোনভ আর ভেলিয়ামিনভের। নিকোলাসের পরিকল্পনার ঠিক উল্টো। নিকোলাসের পরিকল্পনা ছিল শামিলের বাড়ি দখল করে ডাকাতদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার। যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৪৫ সালে দারগো অভিযান চালানো হয়। সে অভিযানে অনেক প্রাণহানি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নিকোলাস পরিকল্পিতভাবে জঙ্গল কেটে এলাকাটা ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তাব তার নিজের বলে মেনে নিলেন। এতে মনে হতে পারে, বনের গাছ কেটে আর খাবার পৌছানোর পথ বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোনোর প্রস্তাব তার নিজের বলে জাহির করার; কারণ, তিনি ১৮৪৫ সালে অভিযানের ঠিক উল্টো যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা নয়। অভিযানের পরিকল্পনার জন্য তিনি গর্ব করেন, ধীরে এগোনোর পরিকল্পনা নিয়েও গর্ব করেন। যদিও একটা আরেকটার ঠিক উল্টো বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। চারপাশের সবার কাছ থেকে সারাক্ষণ সত্যের বদলে নির্লজ্জ তোষামোদি শুনে শুনে তার অবস্থা এমন হয়েছে যে তিনি আর নিজের অসংগতিগুলো দেখতে পান না। বাস্তবতা, যুক্তি বা

BanglaBook.org

আক্কেল-বুদ্ধিতে তিনি কী করছেন, বিচার করে দেখেন না। তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, তার আদেশগুলো যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সংগত হতে বাধ্য। কারণ, তিনি সেগুলো দিয়েছেন, সেগুলো যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন, অন্যায্য বা পরস্পরবিরোধী হোক না কেন। পরের ঘটনাটিতে তার আদেশ তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ধরনের ছিল। সেটা ছিল একাডেমি অব মেডিসিনের ছাত্রের ঘটনা।

ঘটনাটি এ রকম : এক তরুণ পরীক্ষায় দুবার ফেল করলে তৃতীয়বার তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল। পরীক্ষক সেবারও তাকে পাস করায়নি। তরুণটি সেটাকে অন্যায় মনে করে আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। ক্ষিপ্ত হয়ে সে একটা কাগজকাটা ছুরি নিয়ে শিক্ষককে তাড়া করে তার গায়ে কয়েকটা আঁচড় দেয়।

'তার নাম কী?' নিকোলাস জিজ্ঞেস করলেন।

'বেজভস্কি।'

'পোলিশ?'

'পোলিশ বংশোদ্ভূত, রোমান ক্যাথলিক,' চেরনিশভ জবাব দিল।

নিকোলাস ভুরু কোঁচকালেন। তিনি পোলিশদের যথেষ্ট সর্বনাশ করেছেন। সেই সর্বনাশকে বৈধতা দিতে তাকে নিশ্চিত হতে হয় যে সব পোলিশই বদমাশ, তিনি তা-ই মনে করেন এবং তিনি যে সর্বনাশ করেছেন, সেই পরিমাণে তাদের ঘৃণা করেন।

'একটু থামুন,' চোখ মুদে মাথা নিচু করে তিনি বললেন।

চেরনিশভ নিকোলাসকে এ কথা বহুবার বলতে শুনেছেন। তাই জানেন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্রাটকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয়। তিনি চিন্তায় মগ্ন হন, সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত তখন আপনাআপনি চলে আসে, যেন অন্তর থেকে কেউ তাকে তা করতে বলেছে। তিনি ভাবছিলেন, এই ঘটনা তার ভেতরে পোলিশদের প্রতি যেটুকু ঘৃণা জাগিয়েছে, কী করলে তা তুষ্ট হবে। ভেতরের কেউ তাকে নিচের সিদ্ধান্তটি দিল। তিনি প্রতিবেদনটির পাশে তার বড় বড় অক্ষরে তিনটি ভুল বানানে লিখলেন :

'মিক্রুর যোজ্ঞ, কিন্তু খোদার রহম, আমাদের মিত্রস্পর্দ্ধা নেই এবং আমি তা শুরু করতে যাচ্ছি না। তাকে বারোবার এক হাজার লোকের মধ্যে দস্তানাদৌড় দেওয়া হোক। নিকোলাস।' [ভুল বানানের শব্দগুলো ভুল বানানে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো মৃত্যু, যোগ্য আর মৃত্যুদন্ড। দস্তানার মার শাস্তিতে অপরাধীকে দুই সারি সৈন্যের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে হয় আর সৈন্যরা তাকে আঘাত করতে থাকে।]

তিনি তার অস্বাভাবিক বড় প্যাঁচানো স্বাক্ষর দিলেন।

নিকোলাস জানতেন, বারো হাজার আঘাত শুধু নির্যাতনে নিশ্চিত মৃত্য

BanglaBook.org

নয়, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতাও। সবচেয়ে শক্তিশালী একটি লোককে মেরে ফেলতে পাঁচ হাজার আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু নির্দয়-নিষ্ঠুর হয়ে তিনি আনন্দ পান আবার রাশিয়ায় মৃত্যুদণ্ড না থাকার আনন্দও পাচ্ছেন।

ছাত্রটির ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত লিখে তিনি কাগজটি চেরনিশভের দিকে ঠেলে দিলেন।

'এই যে, পড়ুন।' তিনি বললেন।

চেরনিশভ পড়লেন এবং সিদ্ধান্তের প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করলেন।

'হ্যাঁ, শাস্তি দেওয়ার সময় কুচকাওয়াজের মাঠে সব ছাত্রকে হাজির থাকতে হবে।' নিকোলাস বললেন।

'এটা তাদের জন্য ভালো হবে! আমি সব বিপ্লবী চেতনাকে নির্মূল করে ফেলব!' তিনি ভাবলেন।

'তা-ই করা হবে,' চেরনিশভের জবাব; একটু থেমে কপালের চুলের গোছাটি ঠিক করে ককেশাসের প্রতিবেদনটি তুললেন।

'প্রিন্স ভরন্তসভের চিঠির কী জবাব দিতে হুকুম করেন?'

'চেচনিয়ায় বাড়িঘর আর খাদ্য পৌঁছানোর পথ বন্ধ করার আদেশ কঠোরভাবে পালন করতে হবে আর হামলা করে তাদের ব্যতিব্যস্ত করতে হবে,' নিকোলাস বললেন।

'আর হাজি মুরাদকে নিয়ে কী করতে আদেশ দিচ্ছেন?'

'কেন? ভরন্তসভ তো লিখেছে, তাকে ককেশাসে ব্যবহার করতে চায়।'

'এটা কি বিপজ্জনক নয়?' চেরনিশভ বললেন। নিকোলাসের দৃষ্টি এড়িয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় প্রিন্স ভরন্তসভ মানুষকে বেশি বিশ্বাস করেন।'

'তাই, আপনি কী মনে করেন?' ভরন্তসভের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে চেরনিশভের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে নিকোলাস তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করলেন।

'আমি ভাবছিলাম, তাকে মধ্য রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়াই নিরাপদ।'

'আপনি ভাবছিলেন!' বিদ্রূপের সুরে বললেন নিকোলাস। 'কিন্তু আমি তা ভাবছি না। আমি ভরন্তসভের সঙ্গে একমত। তাকে সেভাবেই জবাব দিন।'

'তা-ই দেব,' বলে উঠে মাথা নুয়ে বিদায় নিলেন চেরনিশভ।

দোলগোরুকিও মাথা নুয়ে বিদায় নিল, সারা সময়ে শুধু (নিকোলাসের প্রশ্নের জবাবে) সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে দু-একটি শব্দ উচ্চারণ করে।

চেরনিশভের পর নিকোলাস পাশ্চাত্যের প্রদেশগুলোর জেনারেল-গভর্নর বিবিকভকে দর্শন দিলেন। অর্থোডক্স ধর্মমত মানতে নারাজ বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বিবিকভ যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা অনুমোদন করলেন। যারা আত্মসমর্পণ করেনি, তাদের সবাইকে সামরিক আদালতে বিচারের আদেশ

BanglaBook.org

দিলেন। সেটাও দস্তানাদৌড়ের সমান। তারপর তিনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদককে সৈনিক হিসেবে খাটতে পাঠানোর আদেশ দিলেন। সম্পাদকের অপরাধ, সে কয়েক হাজার রাষ্ট্রীয় চাষিকে সম্রাটের খামারে বদলির খবর ছেপেছিল।

'আমি এটা প্রয়োজন মনে করেই করছি,' বললেন নিকোলাস। 'আমি এটা নিয়ে আলোচনা করতে দেব না।'

বিবিকভ ইউনিয়েট [ইউনিয়েটরা রোমের পোপকে স্বীকার করে। অন্যান্য বিষয়ে রুশো-গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের সঙ্গে তাদের বিরোধ নেই] চাষিদের ব্যাপারে দেওয়া আদেশটির নিষ্ঠুরতা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন (তখনকার দিনে একমাত্র স্বাধীন চাষি) রাষ্ট্রীয় চাষিদের রাজার অধীনে নিয়ে আসার অন্যায়টাও। এর ফলে ওই চাষিরা রাজপরিবারের দাসে পরিণত হবে। কিন্তু ভিন্নমত প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। নিকোলাসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার অর্থ ছিল এখনকার চমৎকার পদমর্যাদাটি হারানো। এটা পেতে বিবিকভের চল্লিশ বছর লেগেছে এবং বেশ লাগছে এবং তাই সে অনুগতভাবে রুপালি ছোপ ধরা কালো মাথাটি নুয়ে তার সম্মতি এবং সম্রাটের নিষ্ঠুর, বিবেকহীন অসৎ ইচ্ছা কার্যকর করতে তার প্রস্তুতি জানাল।

বিবিকভকে বিদায় করে তিনি কর্তব্য সুচারুভাবে শেষ করার অনুভূতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বের হয়ে গেলেন। বিহ্ন লাগানো রাজকীয় পোশাক পরে পদকগুলো লাগালেন এবং গলায় রিবন বেঁধে অভ্যর্থনার হলে গেলেন। সেখানে ছিল এক শ জনের বেশি নারী-পুরুষ; পুরুষদের পরনে সামরিক পোশাক আর নিচু গলার অভিজাত পোশাকে মেয়েরা। তারা নিজেদের জায়গায় অস্থিরভাবে তার আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।

নিষ্প্রাণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্ফীত বুক এবং উদর যেন বন্ধনীর নিচ থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। তার ওপর সবার ভীত অনুগত দৃষ্টি তিনি অনুভব করছিলেন। তিনি আধিপত্য বিজয়দৃপ্তভাব গ্রহণ করলেন। কাউকে চিনতে পারলে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দু-একটি শব্দ বিনিময় করলেন, কখনো রুশ, কখনো ফরাসি ভাষায়। তার শীতল কাচের মতো দৃষ্টিতে বিঁধে ফেলে তাদের কথাও শুনলেন।

নববর্ষের সব অভিনন্দন গ্রহণ করে তিনি সেগুলো চার্চে পাঠিয়ে দিলেন। ঈশ্বর তার ভৃত্য যাজকদের মাধ্যমে মাটির মানুষের মতোই নিকোলাসকে স্বাগত জানায় ও প্রশংসা করে। সেসব প্রশস্তি গ্রহণ করে ক্লান্ত হলেও তিনি তা যথাযথভাবে গ্রহণ করেন। এগুলো সবই ঘটে ঠিক যেভাবে ঘটা উচিত।

BanglaBook.org

কারণ, সারা বিশ্বের মঙ্গল ও সুখ তার ওপরই নির্ভর করে। এগুলোতে তিনি ক্লান্ত হলেও বিশ্বকে কখনো সাহায্যবঞ্চিত করেননি।

গির্জার নিম্নমান পাদরি জমকালো পোশাকে সজ্জিত, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। প্রার্থনা শেষ হলে তিনি ভজন শুরু করলেন। চমৎকার গায়ক দল দরদভরা গলায় 'অনেক বছর' ভজনটি ধরল। নিকোলাস চারদিকে তাকিয়ে নেলিদোভাকে দেখতে পেলেন। সুন্দর কাঁধটি নিয়ে জানালার পাশে সে দাঁড়ানো। তিনি তাকে গত রাতের মেয়েটির সঙ্গে তুলনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রার্থনার পর তিনি সম্রাজ্ঞীর কাছে গেলেন। পরিবারের সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটালেন বাচ্চাদের ও স্ত্রীর সঙ্গে মশকরা করে। তারপর হার্মিটেজের [উইন্টার প্যালেসের লাগোয়া জাদুঘর] ভেতর দিয়ে রাজদরবারের মন্ত্রী ভল্কনস্কির কার্যালয়ে গেলেন। অন্যান্য কাজের মধ্যে বিশেষ তহবিল থেকে গত রাতের মেয়েটির মাকে বার্ষিক ভাতা দিতে বললেন। সেখান থেকে তার নিয়মিত ভ্রমণে বের হলেন।

রাতের খাবার দেওয়া হয়েছিল পম্পিয়ান হলে। নিকোলাস ও মিখায়েলের ছোট ছেলেদের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন ব্যারন লিভেন, কাউন্ট রেজভস্কি, দোলগোরুকি, প্রুশিয়ার রাজদূত এবং প্রুশিয়ার রাজার এডিসি।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করার সময় ব্যারন লিভেন আর প্রুশিয়ার রাজদূতের মধ্যে পোল্যান্ডের খারাপ খবরটি নিয়ে মজার আলাপ হচ্ছিল ফরাসি ভাষায়।

'পোল্যান্ড আর ককেশাস রাশিয়ার দুই জ্বালা,' বললেন লিভেন। 'দেশ দুটোর জন্য আমাদের এক লাখ করে সৈন্য দরকার।'

'আপনি কী বললেন, পোল্যান্ড?' রাজদূত কপট বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের এই জ্বালা দিয়ে মেটারনিশ বড় চাল চেলেছেন...

এই সময় সম্রাজ্ঞী হাসি ধরে রেখে মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে ঢুকলেন, তার পিছু পিছু নিকোলাস।

খাওয়ার সময় নিকোলাস হাজি মুরাদের আত্মসমর্পণের কথা বললেন। আরও বললেন, গাছ কেটে আর বেশ কিছু ছোট ছোট দুর্গ বসিয়ে তিনি পাহাড়িদের আটকে ফেলার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তার ফলে ককেশাসের যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়া উচিত।

সেদিন সকালেই নিকোলাসের নিজেকে মহাকৌশলবিদ ভাবার দুর্বলতা নিয়ে রাজদূতদের মধ্যে আলাপ হয়েছিল। তাদের মধ্যে দ্রুত চোখের ইশারা বিনিময় হলো। সেই রাজদূতই নিকোলাসের কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, নিকোলাসের কৌশল-মেধা আবার প্রমাণিত হলো।

BanglaBook.org

খাওয়ার পর নিকোলাস গেলেন ব্যালে নাচের আসরে। সেখানে শত শত স্বল্পবসনা মেয়ে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি জার্মান ব্যালে পরিচালককে ডাকিয়ে আনালেন এবং তাকে একটা হিরের আংটি উপহার দেওয়ার আদেশ দিলেন।

পরদিন চেরনিশভ তার প্রতিবেদনগুলো নিয়ে এলে নিকোলাস আবার ভরন্তসভকে দেওয়া আদেশ পাকা করলেন। হাজি মুরাদ আত্মসমর্পণ করেছেন, তাই চেচেনদের ওপর হামলা বাড়াতে হবে এবং তাদের বেষ্টনী আরও চেপে ধরতে হবে।

চেরনিশভ সেই কথাই লিখলেন ভরন্তসভকে। আরেকজন বার্তাবাহী আরও ঘোড়ার গায়ে আঁচড় বাড়িয়ে জোর কদমে তিবলিস ছুটে গেল।

১৬

নিকোলাসের আদেশ মানতে সে মাসেই সঙ্গে সঙ্গে চেচনিয়ায় আক্রমণ করা হয়, সময়টা ১৮৫২ সালের জানুয়ারি।

আক্রমণে পাঠানো সেনাদলে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক, দুই কোম্পানি কসাক এবং আটটি কামান। হালকা পদাতিক সৈন্যরা উঁচু-নিচু রাস্তার দুপাশ দিয়ে লম্বা সারিতে কুচকাওয়াজ করে যায়। লম্বা বুট, ভেড়ার চামড়ার কোট এবং মাথায় লম্বা টুপি পরা সৈন্যদের কাঁধে রাইফেল, বেল্টভর্তি কার্তুজ।

বৈরী এলাকার মধ্য দিয়ে যত দূর সম্ভব নিঃশব্দে যাওয়াটাই নিয়ম। শুধু মাঝেমধ্যে খাঁড়িতে নামার সময় নড়াচড়ায় কামানগুলো ঝংকার তুলছে। অথবা কামানটানা ঘোড়াগুলো নিঃশব্দে চলার আদেশ না বুঝে নাক দিয়ে বা চিঁহি করে ডাক দিয়ে ফেলেছে। কখনো সারি দুটোর দূরত্ব বেশি হয়ে গেলে কমান্ডার রেগে চাপা হেঁড়ে গলায় সৈন্যদের বকেছে। শুধু একবার নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল। হঠাৎ কাঁটাগাছের ঝোপের ভেতর থেকে দৌড়ে সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়ল বুকের দিকটা সাদা আর পিঠ কালো একটি ছাগল। ওটার পিছু পিছু দৌড়ে এল একই রকম রঙের একটা পাঁঠা, শিং দুটো পেছনের দিকে বাঁকানো। বড় বড় ঝাঁপে সুন্দর প্রাণী দুটো গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে চলে এলে সৈন্যরা হইহল্লা করে ওগুলোর পেছনে দৌড়াতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা। কিন্তু ছাগল দুটো পিছিয়ে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে বের হয়ে গেল। কয়েকজন ঘোড়সওয়ার পিছু নিলে তাদের কুকুরগুলো পাখির

BanglaBook.org

মতো উড়ে পাহাড়ের দিকে ধাওয়া করে।

তখনো শীতকাল। দুপুর হতে চলেছে। খুব ভোরে রওনা করে সেনাদল তিন মাইল হেঁটে এসেছে। সূর্য অনেক ওপরে উঠে তেজি হয়ে যাওয়ায় সৈন্যদের গরম লাগছিল। সূর্যের আলো এত উজ্জ্বল যে বেয়নেটের চকচকে ইস্পাতের ফলার দিকে তাকানো কষ্টকর ছিল। কামানে লাগানো পিতলের ওপর প্রতিফলন ছিল ছোট ছোট সূর্যের মতো। সেদিকে তাকানোও কষ্টকর।

সেনাদলটি টলটলে পানির খরস্রোতা একটি ঝরনা পার হয়ে এসেছে। তাদের সামনে চষা খেত আর ঘাসভর্তি অগভীর খাদ। আরও সামনে অন্ধকার রহস্যময় বনে ঢাকা পাহাড়গুলো। সেগুলোর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে দুরারোহ পাহাড়। তারও পরে চিরসুন্দর সব সময় রূপ বদলানো সুউচ্চ দিগন্তে আলোর সঙ্গে খেলা করে হিরের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে বরফঢাকা চূড়া।

কালো কোট, লম্বা টুপি আর কাঁধে তলোয়ার নিয়ে ৫ম কোম্পানির সামনে ছিল বাটলার। দেহরক্ষী বাহিনী থেকে আসা লম্বা সুদর্শন অফিসার। বেঁচে থাকার আনন্দ, সেই সঙ্গে মৃত্যুভয়, কিছু একটা করার আগ্রহ আর একক ইচ্ছায় চালিত বিশাল একটা কিছুর অংশ হতে পারার সচেতনতার কারণে সে প্রাণবন্ত। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সে কোনো অভিযানে যাচ্ছে। সে ভাবছিল, কী করে যেকোনো মুহূর্তে তাদের ওপর গুলি চলতে পারে। সে তখন মাথা নিচু করে গুলির শাঁই শাঁই শব্দ শুনবে তো না-ই, বরং তা আগের চেয়ে আরও সোজা রাখবে। চারদিকে তাকিয়ে সহযোদ্ধা আর সৈন্যদের দিকে হাসিমুখে তাকাবে। শান্ত গলায় তাদের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করবে।

সেনাদলটি ভালো রাস্তা ছেড়ে কম ব্যবহৃত রাস্তায় ঘুরে গেল। পথটি গেছে যবের গোড়ায় ভরা খেতের মধ্য দিয়ে। সেটা কখন বনের কাছে নিয়ে এসেছিল, তারা খেয়াল করেনি। শাঁই করে অলক্ষুনে শিস দিয়ে একটা গোলা মালগাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের জমি ফাটিয়ে ফেলল।

'শুরু হচ্ছে,' উজ্জ্বল হাসি মুখে তার পাশে চলা এক অহকমীকে বলল বাটলার।

এবং তা-ই হলো। গোলাটার পর বনের আড়াল থেকে ঝান্ডা নিয়ে বের হয়ে এল বিশাল একদল অশ্বারোহী চেচেন। সে দলের মাঝখানে বিরাট একটা সবুজ ঝান্ডা। বাটলার বেশি দূরে দেখতে পেত না। দলের বুড়ো সার্জেন্ট-মেজর অনেক দূরে দেখতে পারত, সে জানাল, শামিল অবশ্যই ওই দলে আছে। অশ্বারোহীরা পাহাড় থেকে বের হয়ে ডান দিকে উপত্যকার সবচেয়ে উঁচু এবং সেনাদলের খুব কাছে চলে এসে নামতে শুরু করল। পুরু কালো কোট আর লম্বা টুপি পরা একজন ছোটখাটো জেনারেল তার দুলকি

BanglaBook.org

চালের ঘোড়ায় বাটলারের কোম্পানির কাছে এসে তাকে ডান দিকে নেমে আসা অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে বলল। বাটলার দ্রুত তার কোম্পানি নিয়ে সেদিকে চলে গেল। কিন্তু উপত্যকায় পৌছার আগেই তার পেছনে কামান দাগার দুটো আওয়াজ। সে ঘুরে দেখল, দুটো কামানের ওপরে ছাইরং ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠে উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ছে। বোঝা গেল, পাহাড়ি অশ্বারোহীরা গোলন্দাজ বাহিনী আসবে ভাবতে পারেনি। তাই পিছু হটতে থাকে। বাটলারের কোম্পানি তাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। পুরো গিরিখাদ ভরে গেল বারুদের গন্ধে। খাদের অনেক ওপরে পাহাড়িদের দ্রুত পালাতে দেখা যাচ্ছে। তবু তারা কসাকদের ওপর গুলি চালানো থামায়নি। কোম্পানিটি পাহাড়িদের আরও ধাওয়া করে চলল। দ্বিতীয় উপত্যকাটির ঢালে চোখে পড়ল ছোট্ট একটি গ্রাম।

পাহাড়িদের পিছু ধাওয়া করে বাটলারের কোম্পানি গ্রামটিতে ঢুকে পড়ে। বাসিন্দাদের কেউ সেখানে ছিল না। সৈন্যদের ভুট্টা, খড় ও কুঁড়েগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট গ্রামটি ভরে গেল ঝাঁজালো ধোঁয়ায়। সৈন্যরা কুঁড়েগুলোর ভেতরে যা পেল, টেনে বের করল। মোরগ-মুরগিগুলো ধরল বা গুলি করল। পাহাড়িরা ওগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি।

ধোঁয়া থেকে কিছুটা দূরে বসে অফিসাররা দুপুরের আহার সেরে মদ ও ধূমপান করছিল। সার্জেন্ট-মেজর একটা কাঠের টুকরায় তাদের জন্য একটা মধুর চাক নিয়ে এসেছে। চেচেনদের কোনো পাত্তাই নেই। বিকেল নেমে এলে তাদের চলে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হলো। গ্রামটির পেছনে সৈন্যদের সারি। বাটলারের কোম্পানি সবার পেছনে। তারা চলতে শুরু করামাত্র চেচেনরা তাদের পেছন থেকে গুলি করতে শুরু করল। সেনাদল খোলা জায়গায় চলে এলে চেচেনরা আর ধাওয়া করল না। বাটলারের কোম্পানির একজনও আহত হয়নি। সে সবচেয়ে খুশি আর তেজিভাব নিয়ে ফিরে চলেছে। সকালের ঝরনাটা হেঁটে পার হয়ে সেনাদলটি ভুট্টাখেত আর ঘাসের ভেতর ছড়িয়ে গেল। প্রতিটা কোম্পানির গায়ক দল সামনে এগিয়ে গিয়ে গান ধরল।

বাদ্যের তালে তালে ঘোড়াগুলো চলছে খোশমেজাজে। কোম্পানির লোমশ কুকুর ট্রেজোরকা লেজ বাঁকিয়ে সামনে সামনে দৌড়ে চলেছে। একজন কমান্ডারের মতো। যেন কোম্পানির দায়িত্ব তারই। বাটলার উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত, শান্ত। যুদ্ধ তার কাছে শুধু সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়ে পুরস্কার এবং এখানকার সহযোদ্ধাদের ও রাশিয়ার বন্ধুদের শ্রদ্ধা আদায়ের উপায়। নিহত বা আহত অফিসার, সৈন্য বা পাহাড়িরা : যুদ্ধের এই

BanglaBook.org

অপর দিকটি তার কল্পনায় কখনো আসেনি। এই কাব্যিক ভাবটি ধরে রাখার জন্য সে অচেতনভাবে নিহত বা আহতদের দিকে তাকানো এড়িয়ে চলে। সেদিন তিনজন নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল বারোজন। সে চিত হয়ে পড়ে থাকা একটি লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক চোখে নমনীয় হাতটির অদ্ভুত ভঙ্গি আর কপালে একটি লাল বিন্দু দেখে আর দাঁড়ায়নি। পাহাড়িরা তার কাছে শুধু অশ্বারোহী যোদ্ধা, যাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

'বুঝেছেন, স্যার!' দুই গানের ফাঁকে বাটলার তার উর্ধ্বতন মেজরকে বলল, 'এটা পিটার্সবার্গের মতো "আইস রাইট, আইস লেফট" নয়। এখানে আমরা আমাদের কাজ করে এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। মাশা আমাদের পাই আর সুন্দর বাঁধাকপির স্যুপ খেতে দেবে। এটাই জীবন। তাই না স্যার? তাহলে এবার "ভোরের সূর্য উঠছে বলে" গানটা হোক!' পছন্দের গানটি গাইতে বলল বাটলার।

বাতাস তাজা ও পরিষ্কার, কোনো গতি নেই। এতটা স্বচ্ছ যে এক শ মাইল দূরের বরফঢাকা পাহাড়কেও মনে হয় এই কাছেই। দুই গানের ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলার শব্দ আর কামানের ধাতব ঝংকার আবহ সংগীতের মতো মনে হচ্ছিল। বাটলারের কোম্পানিতে যে গানটি গাওয়া হচ্ছিল, সেটি লিখেছিল একজন নবিশ সৈন্য। 'সবার চেয়ে আলাদা পদাতিক পদাতিক!' নাচের ছন্দে সেটার সুর। বাটলার তার ঘোড়া নিয়ে ঠিক তার ওপরের পদের অফিসারটির পাশে চলে এল। মেজর পেত্রভের সঙ্গেই সে থাকত। বাটলারের মনে হলো, দেহরক্ষী বাহিনী থেকে ককেশাসে আসতে পারার জন্য সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয়নি। তার বদলি হওয়ার মূল কারণ সে তার সবকিছু তাসের জুয়ায় উড়িয়ে দেয়। তাই সে ভয় করছিল তার আর হারানোর মতো কিছু না থাকলেও সে তাসের নেশা কাটাতে পারবে না। এখন সেগুলো আর নেই, আনন্দ আর সাহসে তার জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে! ভুলে গেছে যে সে ধ্বংস হয়ে গেছে, ভুলে গেছে শোধ না করা ঋণের কথা। ককেশাস, যুদ্ধ, সৈন্যরা, অফিসারবৃন্দ, আধা মাতাল-সাহসী-ভদ্রলোকেরা, মেজর পেত্রভ নিজে—সবকিছুই তার ভালো লাগে। কোনো কোনো সময় এত ভালো লাগে যে সে পিটার্সবার্গে নেই, এটা সত্যি মনে হয় না। পিটার্সবার্গের সেই তামাকের ধোঁয়াভরা ঘর, জুয়ায় তাসের কোনা উঁচিয়ে দেখা, হিসাব রাখার লোকটাকে ঘেন্না করা, মাথায় চাপ ধরা ব্যথা আর নেই। সে আসলেই সাহসী ককেশীয়দের বিখ্যাত এলাকায়।

মেজর ও সার্জনের আরদালির মেয়ে একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকে। মেয়েটিকে আগে মাশা ডাকা হতো, এখন সম্মান দেখিয়ে মেরি দমিত্রিয়েভনা ডাকতে হয়। মেরি দমিত্রিয়েভনা সুন্দরী, মুখে অনেক হালকা বাদামি তিল,

BanglaBook.org

সুন্দর চুল। ত্রিশ বছর বয়সী, নিঃসন্তান। অতীত তার যা-ই হোক, সে এখন মেজরের বিশ্বস্ত সহচরী, তাকে সেবিকার মতো যত্ন করে। এটা খুব দরকার। কারণ, মেজর প্রায়ই পান করে মাতাল হয়ে যায়।

দুর্গে পৌঁছা পর্যন্ত সবকিছু মেজরের পরিকল্পনামতোই ঘটল। মেজর, বাটলার ও সেনাদল থেকে আমন্ত্রিত দুজন অফিসারকে পুষ্টিকর সুস্বাদু খাবার খেতে দিল মেরি দমিত্রিয়েভনা। মেজর মাতাল হওয়া পর্যন্ত খেয়ে আর পান করে ঘরে চলে গেল। বাটলার পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় মাত্রার বেশি চিখির মদ খেয়ে শোবার ঘরে। পোশাক ছাড়ার সময় না পেয়ে তার সুন্দর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথার নিচে হাত রেখে স্বপ্নহীন টানা গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

১৭

যে গ্রামটি ধ্বংস করা হয়েছিল, রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগের রাতে হাজি মুরাদ ছিল সেখানেই। রুশ সেনাদলের আক্রমণের মুখে সাদো তার পরিবার নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। ফিরে এসে সে দেখল, তার বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ছাদটি ভেঙে পড়েছে, বারান্দার খুঁটিগুলো পোড়া আর ভেতরে ধ্বংসস্তূপ। তার উজ্জ্বল চোখের সুদর্শন ছেলেটিকে, যে উত্তেজনাভরে হাজি মুরাদের দিকে অপলক তাকিয়েছিল, চাদর দিয়ে ঢেকে ঘোড়ার পিঠে করে মসজিদে আনা হয়েছে। পিঠে বেয়নেটের আঘাতে তাকে মারা হয়েছে। যে সম্মানিতা মহিলা তার বাড়িতে হাজি মুরাদের সেবা করেছিলেন, তিনি তার ছেলের মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে। পরনের সুন কুঁচি দেওয়া জামাটি ছিঁড়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণার শুকনো স্তন। চুল ঝুলে আছে নিচের দিকে। নখের আঁচড়ে মুখ থেকে ঝরছে রক্ত। অবিরাম বিলাপ করে তিনি কাঁদছেন। সাদো খন্তা-কোদাল হাতে আত্মীয়দের নিয়ে ছেলের জন্য কবর খুঁড়তে চলে গেল। বুড়ো দাদা ভাঙা কুঁড়েটির দেয়ালের পাশে বসে আছে। একটি কাঠি কাটছে আর নির্বিকার দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কেবলই মৌমাছির খামার থেকে এল। সেখানে দুটো খড়ের গোলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে যে খোবানি (এপ্রিকট) আর লাল জামের (চেরি) চারা লাগিয়েছিল, সেগুলো দুমড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ খবর হলো সব কটি মৌচাক আর মৌমাছি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের বিলাপ আর মায়েদের সঙ্গে

BanglaBook.org

শিশুদের কান্না ক্ষুধার্ত গবাদিপশুর দুর্বল হাম্বার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পশুগুলোর জন্য কোথাও কোনো খাবার ছিল না। বড় ছেলেমেয়েগুলো খেলছিল না, ভয়ার্ত চোখে বড়দের পিছু পিছু চলছিল। ঝরনার পানি পরিকল্পিতভাবে দূষিত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যবহার করা না যায়। মসজিদটিও একইভাবে নোংরা করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম ও তার সহকারীরা তা পরিষ্কার করছেন। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ—সব চেচেনের মনোভাব ঘৃণার চেয়ে বেশি। ঘৃণা নয়; কারণ, তারা রুশ কুত্তাগুলোকে মানুষ বলে মনে করে না। বিবেকহীন নিষ্ঠুরতায় চেচেনদের যে বিকার, বিরক্তি আর বিহ্বল অবস্থা, তাতে ওই জীবগুলোকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে। যেমন ইচ্ছা করে ইঁদুর, বিষধর মাকড় আর নেকড়েকে মারতে। এ রকম ইচ্ছা আত্মরক্ষার মতো সহজাত প্রবৃত্তি।

গ্রামের বাসিন্দারা দ্বিধাগ্রস্ত। এত দিন এত পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তোলা গ্রামটির ওপর বিবেকহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে আবারও এমন হামলা হতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা সেখানে থেকেই গ্রামটা মেরামত করবে, নাকি মনের বিকার ও অপমান সয়ে নিয়ে তাদের ধর্মীয় নির্দেশনা না মেনে রুশদের বশ্যতা স্বীকার করবে। বয়স্করা নামাজ পড়ে দোয়া করল। তারপর সবাই একমত হয়ে সাহায্য চেয়ে শামিলের কাছে দূত পাঠাল এবং তারা ধ্বংস করা সবকিছু মেরামত শুরু করল।

১৮

আক্রমণের পরের সকালে, খুব ভোরে নয়, বাটলার পেছনের গাড়িবারান্দা দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। নাশতার আগে তাজা বাতাসে একটু হেঁটে আসবে ভেবে। সাধারণত পেত্রভের সঙ্গেই সে যায়। সূর্য ইতিমধ্যে পাহাড়গুলোর ওপরে উঠে গেছে। রাস্তার ডান দিকের আলোয় উজ্জ্বল সাদা দেয়ালগুলোর দিকে তাকালে চোখ ব্যথা করছে। অথচ সব সময়ের মতো চোখ জুড়িয়ে যায় বাঁ পাশের দেয়ালগুলোর দিকে বা পেছনে অন্ধকার কমে আসা বনে ঢাকা উঁচু পাহাড়ের দিকে বা মেঘের ভান করা বরফের চূড়াগুলোর আবছা রেখার দিকে তাকালে। বাটলার পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল। নিশ্বাস নিল বুক ভরে আর বেঁচে আছে বলে এবং এই সুন্দর জায়গায় আছে বলে তার আনন্দ হলো।

BanglaBook.org

গতকাল যাওয়া-আসার দুবারই, বিশেষ করে খুব গরমের মধ্যে পিছিয়ে আসার সময়, সে এত ভালো ব্যবহার করেছে ভেবে সে মনে মনে খুশি ছিল। ফিরে আসার পর পেত্রভের রক্ষিতা মাশা (বা মেরি দমিত্রিয়েভনা) যেভাবে প্রত্যেককে যত্ন করে রাতের খাবার দিয়েছে, তাতেও সে খুশি। তার মনে হয়েছে, মাশা তাকে একটু বেশিই যত্ন করেছে।

মেরি দমিত্রিয়েভনার মোটা বেণি, চওড়া কাঁধ, বিশাল বক্ষ এবং গোলাপি তিলে ভরা মুখে উদ্ভাসিত হাসি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাটলারকে আকর্ষণ করে। অবিবাহিত সুঠাম যুবক বাটলারের এমনও মনে হয়েছে যে মাশা তাকে কামনা করে। কিন্তু সে মনে করে, সেটা তার সরল ভালোমানুষ সহকর্মীর প্রতি অন্যায় হবে। তাই সে মাশার প্রতি সম্মান দেখাত এবং সেটা করতে পারায় নিজের ওপর খুশি ছিল।

এই চিন্তায় তার মগ্নতা ভেঙে গেল সামনের ধুলোভরা রাস্তাটায় অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজে। মনে হলো বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আসছে। সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল রাস্তার শেষ মাথায় একটা দল তার দিকে হেঁটে আসছে। জনা বিশেক কসাকের সামনে দুজন অশ্বারোহী। একজনের পরনে একটা সাদা চাপকান, মাথায় লম্বা পাগড়ি। অন্যজন রুশ অফিসার, গাঢ় গায়ের রং। ইগলের ঠোঁটের মতো নাক। তার পোশাক ও অস্ত্রে অনেক রুপার পদক। পাগড়ি পরা লোকটার ঘোড়াটির রং চমৎকার বাদামি, কেশর আর লেজের রং একটু হালকা। ওটার মাথাটা ছোট, সুন্দর চোখ। অফিসারটির ঘোড়া একটা বড় সুদর্শন কারাবাখ। ঘোড়াপ্রেমিক বাটলার তক্ষুনি প্রথম ঘোড়াটার শক্তি বুঝতে পারল। লোকগুলো কারা, দেখার জন্য সে দাঁড়াল।

'এটা কমান্ডারের বাসা?' জিজ্ঞেস করল অফিসারটি। উচ্চারণ আর শব্দগুলো প্রতারণা করে তার বিদেশি পরিচয় ফাঁস করে দিল।

'হ্যাঁ,' বলে বাটলার অফিসারটির কাছে এসে পাগড়ি পরা লোকটিকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ইনি কে?'

'ইনি হাজি মুরাদ। কমান্ডারের সঙ্গে থাকবেন বলে এসেছেন।' অফিসারটি বলল।

বাটলার হাজি মুরাদ সম্বন্ধে এবং রাশিয়ার কাছে তার আত্মসমর্পণের খবর জানত। কিন্তু তাকে ছোট্ট দুর্গটায় দেখার আশা করেনি। হাজি মুরাদ তার দিকে বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'সুপ্রভাত, কটকিল্ডি।' তার শেখা তাতারি ভাষায় স্বাগত জানানোর শব্দটা বলল বাটলার।

'সবুল!' (ভালো থাকুন!) হাজি মুরাদের জবাব। ঘোড়াটি বাটলারের কাছে

BanglaBook.org

নিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে। হাতটার দুই আঙুলে তার চাবুকটা ঝুলছিল।

'আপনিই কি সেনাপ্রধান?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না, সেনাপ্রধান ভেতরে। আমি তাকে ডেকে আনছি,' অফিসারটিকে এই কথা বলে বাটলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিল। অতিথিদের দরজাটা বন্ধ ছিল। মেরি দমিত্রিয়েভনা ওটাকে তা-ই বলত। কয়েকবার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজাটা কেউ না খোলায় বাটলার ঘুরে পেছনের দরজায় গিয়ে নিজের আরদালিকে ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। দুই আরদালির কাউকে না পেয়ে সে গেল রান্নাঘরে। সেখানে ছিল মেরি দমিত্রিয়েভনা। তার আস্তিন কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে মোটা সাদা হাত দিয়ে হাতের মতোই সাদা ময়দা মাখিয়ে ছোট ছোট পিণ্ড করে রাখছে। ওগুলো দিয়ে পাই বানাবে।

'আরদালিরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বাটলার।

'মদ খেতে গেছে। তুমি কী চাও?' জিজ্ঞেস করল মেরি দমিত্রিয়েভনা।

'সামনের দরজা খুলতে হবে। তোমার বাড়ির সামনে একদল পাহাড়ি। হাজি মুরাদ এসেছে!'

'অন্য কিছু বানিয়ে বলো!' হেসে বলল মেরি দমিত্রিয়েভনা।

'ঠাট্টা না, সে আসলেই গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে!'

'সত্যি বলছ?'

'তোমার সঙ্গে শয়তানি করব কেন? গিয়ে দেখে এসো সে গাড়িবারান্দায়!'

'হায় খোদা, ঝামেলা হলো তো!' আস্তিন নামিয়ে তার মোটা বেণিতে কাঁটাগুলো ঠিক আছে কি না দেখল। আর বলল, 'আমি তাহলে আইভান মাতভিয়েচকে তুলে দিই।'

'না, আমিই যাই। বন্দারেঙ্কো, দরজাটা খুলে দাও।' পেত্রভের আরদালি তখনই এসেছিল। তাকে বলল বাটলার।

'সেটাই ভালো হয়!' মেরি দমিত্রিয়েভনা আবার কাজে লেগে গেল।

হাজি মুরাদ তার বাড়িতে এসেছে শুনে মেজর আইভান মাতভিয়েচ পেত্রভ একটুও অবাক হয়নি। সে জানত হাজি মুরাদ গ্রজনিতে। বিছানায় উঠে বসে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে পোশাক পরতে শুরু করল। জোরে গলাখাঁকারি দিয়ে 'শয়তানটাকে' তার কাছে পাঠানোর জন্য গজগজ করল।

তৈরি হয়ে সে আরদালিকে একটু ওষুধ দিতে বলল। আরদালি জানত 'ওষুধ' মানে ভোদকা, নিয়ে এল সে।

'মিশিয়ে মদ খাওয়ার মতো খারাপ কিছু নেই,' বিড়বিড় করে সে ভোদকাটা ঢোঁক দিয়ে এক কামড় রাইয়ের রুটি খেল। 'কাল চিখির খেয়েই মাথাটা ধরেছে...এখন কাজে যেতে হচ্ছে,' বলতে বলতে বসার ঘরে গেল। হাজি মুরাদ আর অফিসারটাকে বাটলার সেখানে এনে বসিয়েছে।

BanglaBook.org

অফিসার লেফট ফ্ল্যাঙ্কের কমান্ডারের আদেশটা মেজরের হাতে দিল। তাতে হাজি মুরাদকে তার কাছে রেখে চরদের মাধ্যমে পাহাড়িদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই যেন কসাকদের একটা দল সঙ্গে না নিয়ে তাকে দুর্গের বাইরে যেতে দেওয়া না হয়।

কাগজটা পড়ে মেজর হাজি মুরাদের দিকে তাকাল এবং আবার কাগজটা খুঁটিয়ে দেখল। এভাবে কয়েকবার এদিক-ওদিক চোখ ফেলে শেষে হাজি মুরাদের দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে! উনি এখানেই থাকুন। তাকে বলে দেন যে তাকে বাইরে যেতে না দেওয়ার আদেশ আছে। সেটা মানতে হবে! বাটলার, ওনাকে কোথায় থাকতে দেওয়া যায়? অফিস ঘরে?'

বাটলার জবাব দেওয়ার আগেই মেরি দমিত্রিয়েভনা রান্নাঘর থেকে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে মেজরকে বলল, 'কেন তাকে এখানে রাখবে! তাকে মেহমানদের ঘর আর ভাঁড়ার ঘরটা দেব। তাতে তার ওপর চোখ রাখা যাবে,' হাজি মুরাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল মেরি। চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

'মেরি দমিত্রিয়েভনা ঠিক বলেছে,' বলল বাটলার।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে; যাও! মেয়েদের এখানে কোনো কাজ নেই,' ভুরু কুঁচকে বলল মেজর।

কথাবার্তার পুরো সময়টা হাজি মুরাদ ছোরার বাঁটে হাত রেখে বসে ছিল। ঠোঁটে তার মৃদু অবজ্ঞার হাসি। তিনি বললেন, যেখানেই রাখা হোক, তার কাছে সবই সমান, সরদার যা কিছুর অনুমতি দিয়েছে, তার বেশি তার চাই না। পাহাড়িদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি আছে। তাই তাদের যেন এখানে আসতে দেওয়া হয়।

মেজর বলল তা করা হবে। আর বাটলার যেন তাদের কিছু খাবার দিতে এবং ঘরগুলো গুছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সে এর মধ্যে অফিসে গিয়ে দরকারি কাজগুলো করবে আর আদেশ দেবে।

নতুন লোকদের সঙ্গে হাজি মুরাদের সম্পর্ক কী হবে, তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল। শুরু থেকেই তিনি মেজরের ব্যবহারে বিরক্ত। তাই তিনি ত্যাড়াভাবে কথা বলেছেন। মেরি দমিত্রিয়েভনা রান্না করে খাবার দিয়ে গেল। তাকে তিনি পছন্দ করেছেন। তার সারল্য, বিশেষ করে বিদেশি ধরনের সৌন্দর্য তার ভালো লেগেছে। হাজি মুরাদের প্রতি আকর্ষণ নিজের অজান্তেই সে বুঝিয়ে দেওয়ায় হাজি মুরাদ বশীভূত। হাজি মুরাদ তার দিকে না তাকাতে বা তার সঙ্গে কথা না বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ দুটো মেরির চলাফেরার পথেই ঘুরেছে। দেখা হওয়ার মুহূর্ত

BanglaBook.org

থেকে বাটলারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন তার জীবন সম্বন্ধে, নিজের জীবন সম্বন্ধে। গুপ্তচরেরা তার পরিবার সম্পর্কে যে খবর এনেছে, সেগুলো বলেছেন। এমনকি নিজের কী করা উচিত, তাই নিয়ে বাটলারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন।

চরদের মাধ্যমে তিনি ভালো খবর পাননি। দুর্গে তার প্রথম চার দিনে তারা দুবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দুবারই তারা খারাপ খবর আনে।

১৯

হাজি মুরাদ রুশদের কাছে পালিয়ে যাওয়ার পরপর তার পরিবার ভিদেনোয় নিয়ে যাওয়া হয়। শামিল কী ঠিক করে, সে জন্য তাদের পাহারায় রাখা হয়েছে। তার মা ফাতিমা এবং দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান অফিসার ইব্রাহিম রশিদের বাড়িতে পাহারায়। হাজি মুরাদের আঠারো বছর বয়সী ছেলে ইউসুফ কারাগারে বন্দী। কারাগার মানে সাত ফুটের বেশি গভীর একটি গর্ত। ইউসুফ রয়েছে আরও সাতজনের সঙ্গে। তারা সবাই ভাগ্যে কী ঘটে, তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সিদ্ধান্ত দিতে দেরির কারণ শামিল গেছেন রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

যুদ্ধের পর ভিদেনোয় তিনি ফিরে এলেন ১৮৫২ সালের ৬ জানুয়ারি। রুশরা বলছে, যুদ্ধে হেরে তিনি ভিদেনোয় পালিয়ে গেছেন। আর শামিল ও মুরিদরা বলছে, তারাই রুশদের ঠেকিয়ে দিয়ে জয়ী। ওই যুদ্ধে শামিল নিজে রাইফেল চালান। সেটা তিনি করেন খুব কম। তলোয়ার নিয়েও তিনি রুশদের সরাসরি তাড়া করেন। মুরিদরা তাকে বাধা দেয়। শামিলের পাশেই তার দলের দুজন সেখানেই মারা যায়।

শামিল ফিরে আসেন দুপুরের দিকে। মুরিদরা তাকে ঘিরে ধ্বনি দিতে দিতে আসছিল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। শামিলের বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত তারা অনবরত রাইফেল ও পিস্তলের গুলি ফোটাতে থাকে।

বড় গ্রামটির সব বাসিন্দা তাদের নেতাকে দেখার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিল। অনেকে নিজেদের রাইফেল ও পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ছিল বিজয়ের উত্তেজনায়। শামিল একটা আরবি সাদা ঘোড়ায় আসছিলেন। তার

BanglaBook.org

বাড়ির কাছাকাছি আসায় ঘোড়াটা চলছিল নিজের ইচ্ছায়। ঘোড়াটার জিন বা লাগাম ছিল খুব সাধারণ, কোনো সোনা-রুপা লাগানো ছিল না। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা লাল চামড়ার চাবুকটার মাঝবরাবর টানা দাগ। ধাতুর পাদানিগুলো কাপের মতো দেখতে। লাল চাদরের নিচ থেকে জিনটার কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। ইমাম পরেছিলেন এক পরত কালো পশম লাগানো বাদামি সুতির চাদর। ঘাড় ও হাতের কাছে পশমগুলো দেখা যাচ্ছিল। তার চিকন লম্বা কোমরে একটা কালো ফিতে দিয়ে চাদরটা বাঁধা। তাতে গাঁথা একটা ছোরা। তার মাথায় লম্বা টুপিটার ওপরের দিকটা সমান, পাশে কালো ঝালর ঝোলানো। টুপিটার চারপাশে সাদা পাগড়ি। সেটার এক দিক তার কাঁধ ছুঁয়েছে। তিনি পরেছিলেন কিনারে নকশা করা আঁটসাঁট কালো পায়জামা আর সবুজ চপ্পল।

আসলে ইমাম উজ্জ্বল কিছু পরেননি। না সোনা, না রুপা। তার লম্বা খাড়া সুঠাম শরীর, অলংকারহীন পোশাক, সোনা-রুপা লাগানো কাপড় ও অস্ত্রসজ্জিত মুরিদরা তাকে ঘিরে রাখলে মানুষের মনে ঠিক তার কাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া হয়। কীভাবে তা সৃষ্টি করতে হয়, সেটাও তিনি জানতেন। সুন্দর করে ছাঁটা লালচে দাড়ির ডৌলে আঁটা নিষ্প্রভ চেহারায় চোখ দুটো সব সময় কুঞ্চিত, যেন পাথরে খোদাই করা—অনড়। গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তার ওপর হাজারখানেক লোকের উৎসুক দৃষ্টি অনুভব করতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কারও দিকে তাকাননি।

ইমামের আগমন দেখার জন্য হাজি মুরাদের স্ত্রীরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে বারান্দায় বের হয়ে এসেছিল। শুধু তার বৃদ্ধা মা ফাতিমা বাইরে যাননি। তার পাকা চুল ঝুলিয়ে ঘরের মেঝেয় বসে ছিলেন। তার হাঁটু দুটোকে বেড় দিয়ে রেখেছিল লম্বা হাত দুটো। আগুনের স্তূপে জ্বলন্ত কয়লাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকায় তার কালো চোখ দুটো জ্বলছিল। তার ছেলের মতো তিনিও সব সময় শামিলকে ঘৃণা করতেন। এখন আগের চেয়ে বেশি ঘৃণা করছেন এবং তাকে দেখতে চাননি। হাজি মুরাদের ছেলেও এই বিজয়ীর বেশে প্রবেশ দেখেনি। সে তার অন্ধকার তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত গর্তে বসে শুধু গুলি আর ধ্বনির শব্দ শুনেছে। স্বাধীনতাবঞ্চিত প্রাণীর তরুণেরা যেভাবে যন্ত্রণা অনুভব করে, সে-ও তেমনি করছিল। দুর্ভাগা, অপরিচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত অন্য সহবন্দীদের দেখছিল। আর একে অন্যকে ঘেন্না করছিল। যারা তাদের ইমামের চারপাশে ঘোড়ার ওপর বসে মুক্ত বাতাসে বুক ভরে প্রশস্তি গাইছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তাদের ওপর তার গভীর হিংসা হলো।

গ্রামটি পার হয়ে শামিল তার বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে গেলেন। দুজন সশস্ত্র শান্ত্রি খোলা ফটকের কাছে তার দিকে এগিয়ে

BanglaBook.org

এল। পুরো আঙিনায় মানুষের ভিড়। অনেকেই বহুদূর থেকে নিজেদের কাজে এসেছে। কেউ কেউ দরখাস্ত নিয়ে এসেছে। কাউকে শামিল ডাকিয়ে এনেছেন বিচার করে শাস্তি দেওয়ার জন্য। শামিল ভেতরে ঢুকলে সবাই দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাত রেখে সালাম দিল। তিনি আঙিনা থেকে অন্দরমহলে যাওয়া পর্যন্ত অনেকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। তিনি জানতেন, আঙিনায় অপেক্ষাকারীদের অনেককে তিনি পছন্দ করেন না। অনেকে দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে আবেদন করছে। চেহারায় সেই স্থির পাথুরে দৃষ্টি রেখে সবাইকে কাটিয়ে তিনি অন্দরমহলে ঢুকলেন। ফটকের বাঁ দিকে নিজের ঘরের বারান্দার কাছে ঘোড়া থেকে নামলেন। তিনি যুদ্ধের ধকলে ক্লান্ত। যতটা না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক। কারণ, প্রকাশ্যে বিজয়ী হওয়ার ঘোষণা দিলেও ভালো করেই জানতেন তিনি পরাজিত। তিনি জানতেন, অনেক চেচেন গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অস্থির চঞ্চল চেচেনরা দোমনা ছিল। আর সীমান্তের কাছের চেচেনরা রুশদের সঙ্গে যোগ দিতে তৈরি।

এগুলো তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। এর বিহিত করা দরকার। কিন্তু সে মুহূর্তে শামিল কিছুই ভাবতে চাননি। তার শুধু একটাই চাহিদা—বিশ্রাম। তিনি চাইছিলেন পরিবারের মধ্যে থাকার আনন্দ আর তার প্রিয়তমা স্ত্রীর আদর। সেই আঠারো বছর বয়সী কালো চোখ চঞ্চল হরিণী ঠিক সে মুহূর্তে পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা রাখার বেড়ার অপর দিকে ছিল। (শামিল নিশ্চিত ছিলেন, অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে সে-ও বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখছিল। কিন্তু শুধু তার সান্নিধ্যে যাওয়াই অসম্ভব নয়, তিনি পালকের গদিতে শুয়ে পড়তেও পারছিলেন না। আগে তাকে জোহরের নামাজ পড়তে হবে। যার জন্য সেই মুহূর্তে তার কোনো ইচ্ছা না থাকলেও মানুষের ধর্মীয় নেতা হিসেবে বাদ দিতে পারছিলেন না। নিজের জন্যও তা প্রতিদিনের খাদ্যের মতো। তাই তিনি অজু করে নামাজ পড়লেন এবং তার অপেক্ষায় থাকা লোকদের ডাকলেন।

প্রথমে এলেন জামাল উদ্দিন। তার শ্বশুর ও শিক্ষক। লম্বা পাকাচুল সুদর্শন বৃদ্ধ। বরফের মতো সাদা দাড়ি আর গোলাপি লাল চেহারা। দোয়া পড়ে তিনি শামিলের কাছে যুদ্ধের খবর জানতে চাইলেন। তার অনুপস্থিতিতে পাহাড়ে কী কী ঘটেছে, জানলেন।

বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বংশগত শত্রুতার কারণে খুন, গরু-ভেড়া চুরি এবং তরিকা না মানার (ধূমপান ও মদ্যপান) অভিযোগ করলেন। জামাল উদ্দিন বললেন, হাজি মুরাদ তার পরিবারকে রুশদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কীভাবে লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু তা ফাঁস হয়ে গেলে তাদের

BanglaBook.org

ভিদেনোয় আনা হয়েছে। ইমামের সিদ্ধান্তের জন্য তাদের পাহারায় রাখা হয়েছে। জামাল উদ্দিন আরও বললেন, এসব বিষয় আলোচনার জন্য বয়স্করা তিন দিন মেহমানখানায় অপেক্ষা করছেন। তিনি শামিলকে সেগুলো শেষ করার পরামর্শ দিলেন।

তার ঘরে জাইদা নামের কালো খাড়া-নাক কুশ্রী মহিলা খাবার পরিবেশন করল। শামিল তাকে ভালোবাসেন না কিন্তু সে তার বড় বউ। খেয়েদেয়ে শামিল গেলেন মেহমানখানায়।

ছয় বৃদ্ধ শামিলের পারিষদ। তাদের সাদা, পাকা বা লাল দাড়ি, মাথায় লম্বা টুপি। কারও কারও মাথায় পাগড়ি। সবার পরনে নতুন বেশমেত আর চাপকান। কোমরবন্ধে ছোরা ঝোলানো। শামিল ঘরে ঢুকলে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। শামিল তাদের সবার চেয়ে লম্বা। শামিলসহ সবাই হাত উঠিয়ে চোখ বুজে মোনাজাত করে সবাই বসলেন, শামিল বসলেন একটা বড় তাকিয়ায়। তারপর বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেন। অপরাধীদের বিচার হলো শরিয়া অনুযায়ী। চুরির অপরাধে দুজনের হাত কাটার রায় হলো। খুনের জন্য একজনের রায় শিরশ্ছেদ এবং তিনজনকে মাফ করে দেওয়া হলো। তারপর তারা মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন—কী করে চেচেনদের রুশদের সঙ্গে যোগ দেওয়া থামানো যায়। এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য জামাল উদ্দিন নিচের ঘোষণাটি লেখেন :

'আপনাদের ওপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি আসুক!'

'আমি জেনেছি, রুশরা আপনাদের তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলছে। তাদের বিশ্বাস করবেন না এবং আত্মসমর্পণ করবেন না। ধৈর্য ধরুন। এই জীবনে এর জন্য পুরস্কার না পেলেও পরজীবনে এর পুরস্কার পাবেন। আগে কী ঘটেছিল, স্মরণ করুন। আপনাদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার পর তারা কী করেছিল। আল্লাহ তখন ১৮৪০ সালে আপনাদের সুমতি না দিলে আপনাদের এখন তাদের সৈন্য হয়ে থাকতে হতো। আপনাদের স্ত্রীরা পায়জামা পরতে পারতেন না। তাদের বেইজ্জত করা হতো।

'অতীত দিয়ে বিচার করুন ভবিষ্যতে কী হবে। নাস্তিকদের সঙ্গে থাকার চেয়ে রুশদের শত্রু হওয়া ভালো। সামান্য ধৈর্য ধরুন। আমি কোরআন আর তলোয়ার নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের নেতৃত্ব দেব। এখন আপনাদের কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি সে রকম ইচ্ছা তো দূরের কথা, রুশদের কাছে আত্মসমর্পণের চিন্তাও করবেন না।'

ঘোষণাটি অনুমোদন করে শামিল তাতে সই করে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

BanglaBook.org

এরপর তারা হাজি মুরাদের ঘটনা তুললেন। শামিলের কাছে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি স্বীকার না করলেও জানতেন হাজি মুরাদ তার ক্ষিপ্রতা, দৃঢ়তা আর সাহস নিয়ে তার (শা) পাশে থাকলে চেচেনদের এখন যা ঘটছে, তা ঘটত না। তাই হাজি মুরাদের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলে তাকে আবার কাজে লাগাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়। সে রুশদের সাহায্য করলে কিছুতেই আর পারা যাবে না। তাকে অবশ্যই লোভ দেখিয়ে এনে মেরে ফেলতে হবে। দুভাবে তারা কাজটা করতে পারে। তিবলিসে কাউকে পাঠিয়ে তাকে সেখানেই মেরে ফেলা। না হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে এনে মেরে ফেলা। এখানে আনার একমাত্র উপায় তার পরিবারকে, বিশেষ করে চার ছেলেকে ব্যবহার করা। শামিল জানতেন, ছেলেদের হাজি মুরাদ কত গভীর ভালোবাসেন। তাই তারা ছেলেকে দিয়েই কাজটা করবে।

উপদেষ্টারা আলোচনা শেষ করলে শামিল চোখ বুজে নিঃশব্দে বসে থাকলেন।

উপদেষ্টারা জানতেন, এর অর্থ শামিল এখন আল্লাহর নবীর (সা.) কথা শুনছেন। তিনি তাকে বলে দেন কী করতে হবে। পাঁচ মিনিট পবিত্র নৈঃশব্দ্যে কাটিয়ে শামিল চোখ খুললেন। তারপর তাদের আরও কাছে ঘেঁষে বললেন, 'হাজি মুরাদের ছেলেকে আমার কাছে আনুন।'

'ও এখানেই,' জামাল উদ্দিন বললেন। আসলে হাজি মুরাদের ছেলে ইউসুফকে ভেতরে ডাকার জন্য আগেই বাহিরবাড়ির ফটকের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। পাতলা ফ্যাকাশে ছেলেটি, ছেঁড়াফাটা দুর্গন্ধ কাপড় তার পরনে। তা সত্ত্বেও চেহারা ও স্বাস্থ্য সুন্দর। তার চোখ দুটো দাদি ফাতিমার চোখের মতো কালো আর জ্বলছে।

তার বাবা শামিল সম্বন্ধে যা ভাবত, ইউসুফ তেমন ভাবত না। সে অতীতের সব ঘটনা জানত না। জানলেও সেসব দেখেনি বলে বুঝত না শামিলের প্রতি তার বাবার এত শত্রুতা কেন। খুনজাখের সায়েবের ছেলে হিসেবে যেমন সহজ স্বাধীন জীবন কাটিয়েছে, সে শুধু সেটাই চাইত। তার মনে হতো শামিলের সঙ্গে শত্রুতার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবার অবাধ্য হয়ে এবং বিরোধিতার তেজে সে শামিলের বিশেষ ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। শামিল পাহাড়ি এলাকায় যে শ্রদ্ধা পেত, সে-ও সেভাবেই তাকে শ্রদ্ধা করত। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে কাঁপা পায়ে সে মেহমানখানার দরজার কাছে এল। তার চোখ পড়ল শামিলের আধবোজা চোখে। একটু থামল সে। তারপর শামিলের কাছে গিয়ে তার লম্বা আঙুলওয়ালা হাতে চুমু খেল।

BanglaBook.org

'তুমি হাজি মুরাদের ছেলে?'

'জি, ইমাম।'

'তুমি জানো সে কী করেছে?'

'আমি জানি, ইমাম। আমি এর নিন্দা করি।'

'তুমি লেখাপড়া জানো?'

'আমি মোল্লা হওয়ার জন্য পড়ছিলাম।'

'তাহলে তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দাও, সে ঈদের আগে আমার কাছে ফিরে আসবে কি না। যদি আসে, তাহলে আমি তাকে মাফ করে দেব এবং সবকিছু আগের মতোই চলবে। যদি না আসে, তাহলে তোমার দাদি, মা এবং অন্যদের ভিন্ন গ্রামে পাঠিয়ে দেব, আর তোমার কল্লা কেটে ফেলব!'

ইউসুফের চেহারায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। শামিলের কথা বুঝেছে, মাথা নেড়ে সায় দিল।

'চিঠিটা লিখে আমার লোকের হাতে দিয়ো।'

শামিল কথা শেষ করে অনেকক্ষণ নীরবে ইউসুফের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'লিখে দাও—তোমার ওপর আমার দয়া হচ্ছে। তোমাকে মারব না। তোমার চোখ দুটো তুলে নেব। সব বিশ্বাসঘাতকের আমি তা-ই করি!...যাও!'

শামিলের সামনে ইউসুফ শান্ত ছিল। কিন্তু তাকে মেহমানখানার বাইরে নিয়ে এলে সে তার পাহারাদারের ছোরাটা কেড়ে নিয়ে নিজেকে জখম করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে ধরে বেঁধে ফেলে গর্তে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ পরে শামিল একটা পশমের পরত লাগানো চাদর গায়ে তার স্ত্রীদের ঘরগুলোর দিকে গেলেন। সোজা ঢুকলেন আমিনার ঘরে। কিন্তু তাকে সেখানে পেলেন না। সে বড় বউদের সঙ্গে ছিল। শামিল দরজার পেছনে লুকিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু আমিনা তার ওপর খেপে ছিল। তিনি জাইদাকে রেশমি কাপড় দিয়েছেন, তাকে দেননি। সে তাকে তার ঘরে ঢুকে তাকে খুঁজতে দেখেছে। তাই ইচ্ছা করেই দেরি করছিল। জাইদার ঘরের দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। তার ঘরে শামিলের যাওয়া দেখে সে মনে মনে হাসছিল।

তার জন্য অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে শামিল যখন নিজের ঘরে ফিরে এলেন, তখন এশার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

২০

দুর্গে মেজরের বাড়িতে হাজি মুরাদের এক সপ্তাহ কেটে গেল। তিনি সঙ্গে মাত্র দুজন মুরিদ রেখেছিলেন—খানেফি আর এলডার। মেরি দমিত্রিয়েভনা নোংরা খানেফিকে রান্নাঘর থেকে বের করে দিলেও হাজি মুরাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল পরিষ্কার। সে আর তাকে খাবার পরিবেশন করত না, সে কাজটা এলডারকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেকোনো সুযোগে হাজি মুরাদকে দেখতে বা সেবা করতে যেত। তার পরিবারের ব্যাপারে আলোচনায় তার খুব আগ্রহ ছিল। জানত তার স্ত্রী কজন। সন্তান কজন, তাদের বয়স কত। কোনো চর তার সঙ্গে দেখা করতে এলেই সে আলোচনার ফলাফল জানতে সব রকম চেষ্টা করত।

এই সপ্তাহে বাটলার আর হাজি মুরাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো সময় হাজি মুরাদ তার ঘরে যেতেন বা বাটলার যেত তার ঘরে। কখনো তারা দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলতেন, কখনো ইশারা-ইঙ্গিতে বা হাসিতে।

হাজি মুরাদ বাটলারকে পছন্দ করতেন বোঝাই যায়। তার সঙ্গে এলডারের সম্পর্ক দিয়ে সেটা বোঝা যায়। বাটলার হাজি মুরাদের ঘরে এলে এলডার মধুর হাসি দিয়ে তাকে স্বাগত জানায়, তার ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে। তাড়াতাড়ি একটা তাকিয়া নামিয়ে তাকে বসতে দেয়। তার তলোয়ার নিয়ে এলে তা খুলে রাখতে সাহায্য করে।

বাটলার হাজি মুরাদের ধর্মভাই নোংরা খানেফির সঙ্গেও ভাব জমিয়ে ফেলে। খানেফি অনেক পাহাড়ি গান জানত এবং গাইতও ভালো। বাটলারকে খুশি করার জন্য হাজি মুরাদ প্রায়ই খানেফিকে গান গাইতে বলতেন। নিজের পছন্দের গানগুলো গাইতে বলতেন। খানেফির গলা ছিল চড়া এবং অতি চমৎকার পরিষ্কার গলায় ভাবগুলো ফুটিয়ে গাইত। একটা গান হাজি মুরাদের বিশেষ পছন্দের। সেটার পবিত্র বেদনাবিধুর সুরে বাটলার অভিভূত। দোভাষীকে সে গানটির অর্থ করে দিতে বলেছিল।

গানটির বিষয়বস্তু হাজি মুরাদ ও খানেফিদের দুই বংশে শত্রুতা। তার কথাগুলো এমন :

'আমার গোরের মাটি শুকিয়ে যাবে,
মা, মা গো আমার!
তুমি ভুলে যাবে যে আমায়,
আমার ওপর বয়ে যাবে ঘাসসিঁড়ি ঢেউ,

BanglaBook.org

বাবা, আমার বাবা!
তোমাকেও বিঁধবে না আমার শোক!
যখন গভীর চোখে অশ্রু শুকোবে তোমার,
বোন, আমার বোন!

শোকে আর অস্থির হবে না তো কেউ!
'তুমি তো আমার ভাই, বড় ভাই কখনো ভুলবে না,
আমার বদলা তুমি নিতে পারোনি!
তুমি তো আমার ভাই, ছোট ভাই করবে মাতম,
যত দিন না ঘুমাবে আমারই পাশে!

'তপ্ত হয়ে এসেছিলে আমার অবজ্ঞার মৃত্যুবাহী গুলি,
তুমিই তো ছিলে আমার কৃতদাস!
এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকা, ঘোড়ার পায়ের ঘায়ে হয়েছ মথিত!
তুমিই তো ঢেকে দেবে আমার শরীর!
'হে মৃত্যু, শীতল চিত্রকলা একদা তো আমিই প্রভু, তোমার ঈশ্বর!
শরীর আমার ডুবে যাচ্ছে পৃথিবীর ভেতর;
স্বর্গে যাচ্ছে উড়ে আত্মা আমার।'

হাজি মুরাদ সব সময় গানটি শুনতেন চোখ বুজে, দীর্ঘ টানে গানটি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেলে তিনি রুশ ভাষায় মন্তব্য করতেন, 'ভালো গান! জ্ঞানীদের গান!'

হাজি মুরাদ আসার পর তার এবং তার মুরিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে পাহাড়িদের তেজস্বী জীবনের কাব্য বাটলারকে ভীষণ মুগ্ধ করে। নিজের জন্য সে একটা বেশমেত, একটা চাপকান আর আঁটসাঁট পায়জামা কেনে। কল্পনায় মনে করে সে পাহাড়িদের মতো জীবন কাটাচ্ছে।

হাজি মুরাদের যাওয়ার দিন তাকে বিদায় জানানোর জন্য মেজর কয়েকজন অফিসারকে দাওয়াত দিয়েছিল।

তারা বসে ছিল। কেউ কেউ বসে ছিল যে টেবিলে মেরি দমিত্রিয়েভনা চা ঢালছিল সেটায়, কেউ কেউ ভোদকা, চিখির ও কিছু খাবার রাখা টেবিলটায়। ভ্রমণের জন্য পোশাক পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাজি মুরাদ হালকা দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন।

তারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাজি মুরাদের সঙ্গে হাত মেলাল। মেজর তাকে সোফায় বসতে বললে হাজি মুরাদ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসলেন গিয়ে

BanglaBook.org

জানালার পাশের একটা চেয়ারে।

ঘরে ঢোকার পর নীরবতা তাকে অপ্রস্তুত করেনি। তিনি মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি চেহারা দেখলেন এবং সামোভার ও খাবার রাখা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাজি মুরাদের সঙ্গে উচ্ছল অফিসার পেত্রভস্কির সেই প্রথম দেখা। দোভাষীর মাধ্যমে সে জিজ্ঞেস করল তিবলিস তার ভালো লেগেছে কি না।

'আলিয়া!' তিনি জবাব দিলেন।

'তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ",' দোভাষী বলল।

'এখানকার কী তার ভালো লেগেছে?'

হাজি মুরাদ জবাবে কিছু বললেন।

'তার কাছে থিয়েটার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।'

'সেনাপ্রধানের বাড়িতে বলনাচের আসর তার ভালো লাগেনি?'

হাজি মুরাদ ভুরু কুঁচকালেন। 'প্রতিটি জাতির নিজেদের রীতি আছে! আমাদের মেয়েরা ওই রকম পোশাক পরে না,' মেরি দমিত্রিয়েভনার দিকে চোখ ফেলে তিনি বললেন।

'তার কি তা ভালো লাগেনি?'

'আমাদের একটা প্রবাদ আছে,' হাজি মুরাদ দোভাষীকে বললেন, '"কুকুর গাধাকে মাংস দিল, গাধা কুকুরকে খড় দিল এবং দুজনেই না খেয়ে থাকল,"' তিনি হাসলেন। 'সব জাতিরই নিজেদের রীতি ভালো লাগে।'

কথা আর এগোল না। অফিসাদের কেউ কেউ চা নিলেন। কেউ কেউ খাবার নিলেন। হাজি মুরাদ তাকে দেওয়া চায়ের কাপটা নিয়ে তার সামনে নামিয়ে রাখলেন।

'আপনি মাখন দিয়ে একটা বান খাবেন?' মেরি দমিত্রিয়েভনা তাকে জিজ্ঞেস করল।

হাজি মুরাদ সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

'তাহলে, বিদায় নিতে হবে!' তার হাঁটু ছুঁয়ে বলল বাটলার। 'আবার কবে দেখা হবে?'

'বিদায়, বিদায়,' মৃদু হেসে রুশ ভাষায় বললেন হাজি মুরাদ। 'বিদায় বন্ধু। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় হোক! যাওয়ার সময় হয়েছে!' বলে যে পথে যেতে হবে, হাজি মুরাদ সেদিকে ঘাড় কাত করলেন।

এলডার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাঁধে সাদা একটা জিনিস আর হাতে তলোয়ার। হাজি মুরাদ ইশারা করে তাকে কাছে ডাকলেন। এলডার লম্বা পা ফেলে তার কাছে এসে সাদা চাদর আর তলোয়ারটা দিল। হাজি মুরাদ দাঁড়িয়ে চাদরটা হাতে নিয়ে দোভাষীকে কিছু বলে সেটা মেরি

BanglaBook.org

দমিত্রিয়েভনাকে দিলেন।

দোভাষী বলল, 'তিনি বলছেন তুমি চাদরটার প্রশংসা করেছ, তাই এটা নাও।'

'ওহ্, কেন?' লজ্জা পেয়ে বলল মেরি দমিত্রিয়েভনা।

'এটা দরকার। "আদত", আমাদের রীতি,' বললেন হাজি মুরাদ।

'বেশ, আপনাকে ধন্যবাদ,' চাদরটা হাতে নিয়ে বলল মেরি দমিত্রিয়েভনা। 'ঈশ্বর করুক যেন আপনার ছেলেকে মুক্ত করতে পারেন,' সে বলল। 'তাকে বলো তার ছেলেকে মুক্ত করায় আমি তার সাফল্য কামনা করছি।'

হাজি মুরাদ মেরি দমিত্রিয়েভনার দিকে তাকিয়ে সম্মতিতে মাথা নাড়লেন। তারপর এলডারের কাছ থেকে তলোয়ারটি নিয়ে সেটা মেজরকে দিলেন। সেটা নিয়ে মেজর দোভাষীকে বলল, 'তাকে আমার বাদামি ঘোড়াটা নিতে বলো। তাকে দেওয়ার মতো আমার আর কিছু নেই।'

হাজি মুরাদ মুখের সামনে হাত নেড়ে বোঝালেন কিছুই চাই না এবং নেবেন না। তারপর পাহাড়ের দিকে, পরে নিজের বুকে হাত দেখিয়ে বের হয়ে গেলেন।

সবাই দরজা পর্যন্ত তার পিছু পিছু এল। ঘরের ভেতরে রয়ে যাওয়া অফিসাররা খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে পরখ করল, ওটা ছিল খাঁটি 'গুরদা' (নামের) অত্যন্ত দামি তলোয়ার।

বাটলার হাজি মুরাদের সঙ্গে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গেল, তখনই খুব অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনা ঘটে গেল, যাতে চারদিকে তার নজর, দৃঢ়তা আর ক্ষিপ্রতা না থাকলে হাজি মুরাদ মারা যেতে পারতেন।

কুমুখ এলাকার গ্রাম তাশ-কিচুর বাসিন্দারা রুশদের বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তারা হাজি মুরাদকে শ্রদ্ধা করত। তাই শুধু বিখ্যাত নায়েবকে দেখার জন্য তারা দুর্গে আসত। তিন দিন আগে তারা বার্তাবাহক পাঠিয়ে তাকে শুক্রবার মসজিদে যাওয়ার দাওয়াত দেয়। কিন্তু তাশ-কিচুর কুমুখ প্রিন্সরা জ্ঞাতিবৈরিতার জন্য হাজি মুরাদকে দেখতে পারত না। তাকে দাওয়াত দেওয়ার কথা শুনে তারা ঘোষণা করে যে হাজি মুরাদকে তারা মসজিদে ঢুকতে দেবে না। বাসিন্দারা এত উত্তেজিত হয়ে যায় যে প্রিন্সদের লোকজনের সঙ্গে বাসিন্দাদের লড়াই লেগে যায়। রুশ কর্তৃপক্ষ পাহাড়িদের শান্ত করে এবং হাজি মুরাদকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে খবর পাঠায়।

হাজি মুরাদ মসজিদে যাননি এবং সবাই ভেবেছিলে ব্যাপারটা মিটে গেছে।

কিন্তু বিদায়ের সময় হাজি মুরাদ গাড়িবারান্দায় আসেন। ঘোড়াগুলো সেখানে রাখা ছিল। কুমুখ প্রিন্সদের একজন, বাটলার ও মেজরের পরিচিত

BanglaBook.org

আরসালান খান, বাড়ির সামনে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

হাজি মুরাদকে দেখে সে বেল্ট থেকে পিস্তল বের করে তার দিকে তাক করে। খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও সে গুলি করার আগেই হাজি মুরাদ বিড়ালের মতো আরসালানের দিকে ছুটে যান। আরসালান গুলি করলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

আরসালানের ঘোড়ার লাগাম এক হাতে কেড়ে নিয়ে হাজি মুরাদ তার ছোরা বের করে চিৎকার করে আরসালানকে তাতার ভাষায় কিছু বলেন।

বাটলার আর এলডার দুজনেই দৌড়ে দুই শত্রুর কাছে এসে তাদের হাত ধরে ফেলে। গুলির শব্দ শুনে মেজর বের হয়ে এসেছিলেন।

'এসব কী আরসালান—আমার বাড়িতে এসে ভয়ংকর ঝামেলা শুরু করেছ,' ঘটনা শুনে মেজর বলল। 'এটা ঠিক না, বন্ধু! 'যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি শত্রুর কাছে হেরো না!' কিন্তু আমার বাড়িতে এসে তুমি জবাই শুরু করতে পারো না!'

আরসালান খান, বেঁটেখাটো কালো গোঁফধারী। ফ্যাকাশে হয়ে ঘোড়া থেকে নামল। হাজি মুরাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে মেজরের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গেল। হাজি মুরাদ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মৃদু হেসে ঘোড়াগুলোর দিকে চলে গেলেন।

'সে কেন তাকে খুন করতে চেয়েছিল?' বাটলার দোভাষীকে জিজ্ঞেস করল।

'সে বলছে, এটা তাদের আইন,' দোভাষী বাটলারকে দেওয়া হাজি মুরাদের উত্তর বুঝিয়ে দিল।

'আরসালান কোনো আত্মীয়ের খুনের বদলা নিতে তাকে খুন করার চেষ্টা করে।'

'পথে যদি আবার দেখা হয়?' বাটলারের প্রশ্ন।

হাজি মুরাদ হাসলেন।

'বেশ, সে যদি আমাকে খুন করতে পারে, তাহলে সেটাই আল্লাহর ইচ্ছা। বিদায়,' ঘোড়ার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি আবার রুশ ভাষায় বললেন। তাকে বিদায় জানাতে আসা সবার দিকে তাকালেন এবং তারপর নরম চোখে তাকালেন মেরি দমিত্রিয়েভনার দিকে।

'বিদায়, ম্যাডাম,' তিনি তাকে বললেন। 'আপনাকে ধন্যবাদ!'

'ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন। ঈশ্বর আপনার পরিবারকে মুক্ত করতে সাহায্য করুন!' বলল মেরি দমিত্রিয়েভনা।

তিনি তার কথা বুঝতে পারেননি, কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে মাথা নাড়লেন।

BanglaBook.org

'মনে রাখবেন, বন্ধুকে ভুলবেন না।' বলল বাটলার।

'তাকে বলো, আমি তার খাঁটি বন্ধু, কখনো তাকে ভুলব না।' হাজি মুরাদ দোভাষীর মাধ্যমে উত্তর দিলেন। এক পা খাটো হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত হালকাভাবে শরীরটাকে ঘোড়ার ওপর তুলে দিলেন পাদানি সামান্য ছুঁয়ে। গদিতে বসে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোরা আর তলোয়ার ঠিক করে নিলেন। তারপর একমাত্র ককেশীয় পাহাড়িদের মতো দেমাগি দৃষ্টি নিয়ে তিনি মেজরের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। খানেফি আর এলডারও মেজবান ও অফিসারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এসেছিল। দুলকি চালে তারা মুরশিদের অনুসরণ করছিল।

কেউ বিদায় নিয়ে গেলে যারা রয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিয়ে আলাপ করে।

'দারুণ সাহসী! আরসালান খানের দিকে একদম নেকড়ের মতো ছুটে গিয়েছিল! তার চেহারা বদলে গিয়েছিল!'

'কিন্তু তার মনে কোনো ফন্দি আছে—ভয়ানক শয়তান, আমি বলব,' পেত্রভস্কির মন্তব্য।

'ঈশ্বর যদি রুশদের মধ্যে আরও ওই রকম শয়তান দিতেন!' বিরক্তিভরে হঠাৎ বলল মেরি দমিত্রিয়েভনা। 'আমাদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকেছে, আমরা ভালো ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু দেখিনি। তিনি ভদ্র, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ।'

'তুমি কী করে বুঝলে?'

'বেশ, আমি বুঝতে পেরেছি!'

'সে একদম মুগ্ধ,' কেবলই ঘরে ঢুকে বলল মেজর। 'এটা ঠিক!'

'ঠিক আছে আমি না হয় মুগ্ধ! কিন্তু তাতে তোমার কী? একটা ভালো লোককে কেন খারাপ বলবে? সে তাতার হতে পারে, তারপরও সে ভালো লোক!'

'ঠিক বলেছ, মেরি দমিত্রিয়েভনা,' বাটলার বলল। 'তার পক্ষে তুমি ঠিক কথা বলেছ!'

BanglaBook.org

২১

চেচেন সীমানার কাছাকাছি আমাদের অগ্রবর্তী দুর্গগুলোয় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। আগে যে ঘটনাটার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তারপর মাত্র

দুবার বিপৎসংকেত দেওয়া হয়। তখন কোম্পানিগুলোকে ডাকা হয়েছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যরা সেখানে যায়। কিন্তু দুবারই উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পাহাড়িরা পালিয়ে যায়। একবার ভজভিঝেনস্কে তারা একজন কসাককে মেরে ফেলে আর আটটি ঘোড়া নিয়ে যায়। সেগুলোকে গোসল করানো হচ্ছিল। আগের ঘটনায় গ্রামটি ধ্বংস করার পর আর কোনো হামলা চালানো হয়নি। কিন্তু লেফট ফ্ল্যাঙ্কে নতুন কমান্ডার, প্রিন্স বারিয়াতিনস্কিকে নিয়োগের পর বড় ধরনের একটি অভিযান আশা করা হচ্ছিল। তিনি ভাইসরয়ের একজন পুরোনো বন্ধু। কাবার্ডা রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন। পুরো লেফট ফ্ল্যাঙ্কের কমান্ডার হিসেবে গ্রজনিতে আসেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চেরনিশভের মাধ্যমে ভরন্তসভের কাছে পাঠানো জারের আদেশ পালনের জন্য একটা সেনাদল গড়ে ফেলেছেন। ভজভিঝেনস্কে জড়ো করা সেনাদলটি অবস্থান নেয় দুর্গের বাঁয়ে কুরিনের দিকে। সেখানে শিবির গেড়ে সৈন্যদের রেখে বন কাটা শুরু হয়। তরুণ ভরন্তসভ সুন্দর একটা কাপড়ের তাঁবুতে ছিল। তার স্ত্রী মেরি ভাসিলিয়েভনা প্রায়ই শিবিরে আসত আর রাতটা তাঁবুতে থেকে যেত। বারিয়াতিনস্কির সঙ্গে মেরি ভাসিলিয়েভনার সম্পর্কের বিষয়টা কারও কাছে গোপন ছিল না। নিম্নশ্রেণির অফিসার এবং সৈন্যরা তার সম্পর্কে বাজে বাজে কথা বলত। কারণ, সে শিবিরে থাকলে তাদের ওত পাতার জায়গায় রাত কাটাতে হতো। পাহাড়িদের স্বভাব ছিল কামানগুলো শিবিরের কাছে এনে গোলা ছোড়া। গোলাগুলো সাধারণত লক্ষ্যে পড়ত না। তাই অন্য সময় তাতে বাধা দেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু করা হতো না। কিন্তু এখন মেরি ভাসিলিয়েভনা যাতে কামানের গোলায় আহত না হয় বা ভয় না পায়, সে জন্য পাহাড়িদের বাধা দিতে ওত পাততে পাঠানো হচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত সৈন্যদের সঙ্গে অফিসাররাও মেরি ভাসিলিয়েভনার সম্বন্ধে বাজে কথা বলে।

বাটলার দুর্গ থেকে ছুটি নিয়েছে। ক্যাডেট কোরের এবং কুরিন রেজিমেন্টের পুরোনো বন্ধুরা অর্ডারলি-অফিসার হয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাটলার এসেছে শিবিরে। প্রথম আসার পর তার সময়টা খুব ভালো কেটেছিল। তার জায়গা হয়েছিল পোলতোরাৎস্কির তাঁবুতে। সেখানে অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সবাই তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। আগে একই রেজিমেন্টে থাকার সুবাদে সামান্য পরিচয় থাকায় সে ভরন্তসভের সঙ্গেও দেখা করেছিল। ভরন্তসভ তাকে ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করে এবং প্রিন্স বারিয়াতিনস্কির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়। বাটলারকে জেনারেল কজলভস্কির বিদায়ি ভোজেও দাওয়াত করে। প্রিন্স বারিয়াতিনস্কি আসার আগে কজলভস্কি লেফট ফ্ল্যাঙ্কের কমান্ডার ছিলেন।

BanglaBook.org

ভোজসভাটি ছিল জাঁকালো। এক সারিতে বিশেষ তাঁবু খাটানো হয়। তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছয়টা টেবিল ডিনার সেট, গ্লাস ও বোতল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সবকিছু পিটার্সবার্গে দেহরক্ষী বাহিনীর জীবন মনে করিয়ে দিচ্ছিল। দুটোয় খাবার পরিবেশন করা হয়। টেবিলের মাঝখানে একদিকে বসেছিলেন কজলভস্কি, অন্য পাশে বারিয়াতিনস্কি। কজলভস্কির বাঁ ও ডান দিকে ভরন্তসভ দম্পতি বসেছিল। পুরো টেবিলের দুই পাশে কাবার্ডা আর কুরিন রেজিমেন্টের অফিসাররা বসেছিল। বাটলার বসেছিল পোলতোরাৎস্কির পাশে। তারা দুজন ফুর্তিতে গল্প করছিল আর চারপাশের অফিসারদের সঙ্গে মদ পান করছিল। রোস্ট দেওয়া হলে আরদালিরা ঘুরে ঘুরে শ্যাম্পেনের গ্লাস ভরে দিচ্ছিল। পোলতোরাৎস্কি উদ্বিগ্ন হয়ে বাটলারকে বলল, 'আমাদের কজলভস্কি নিজেকে অভিশাপ দেবে!'

'কেন?'

'তাকে এখন বক্তৃতা দিতে হবে। তিনি মোটেই ভালো বলেন না। এটা গুলির মধ্যে পরিখা দখল করা নয়। তার ওপর পাশে বসা এক মহিলা আর সামনে অফিসাররা!'

'সত্যি, তার জন্য দুঃখ হয়,' অফিসাররা একে অন্যকে বলছিল। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। বারিয়াতিনস্কি তার গ্লাস তুলে কজলভস্কির উদ্দেশে ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। কজলভস্কি উঠলেন এবং তোতলাতে তোতলাতে শুরু করলেন (তার আবার 'কেমন করে' কথাটি বারবার বলার অদ্ভুত অভ্যাস ছিল), 'মহামহিমের আদেশ পালন করতে আমি বিদায় নিচ্ছি। ভদ্রমহোদয়গণ,' তিনি বললেন। 'কিন্তু মনে করবেন আমি সব সময় আপনাদের মধ্যেই আছি। সেই প্রবাদটির সত্যতা আপনারা জানেন "কেমন করে" যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ যোদ্ধা না হয়ে পারেন। অতএব, "কেমন করে" আমি যেসব পদক পেয়েছি..."কেমন করে" মহামান্য সম্রাটের বদান্যতায় আমি যেসব সুবিধা পেয়েছি..."কেমন করে" আমার সব পদ..."কেমন করে" আমার সুনাম..."কেমন করে" সবকিছু নির্ধারিতভাবে..." ক ম ন করে" ' (এখানে তার গলাটা কেঁপে উঠল) "কেমন করে" এর জন্য আমি আপনাদের প্রতি ঋণী, শুধু আপনাদের কাছে বন্ধুরা!' তার মুখের ভাঁজ পড়া ত্বক আরও কুঁচকে গেল, তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এল। '"কেমন করে" আমার অন্তর থেকে আপনাদের প্রতি আন্তরিক ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই!'

কজলভস্কি আর বলতে পারলেন না। ঘুরে অফিসারদের আলিঙ্গন করতে শুরু করলেন। প্রিন্সেস রুমালে তার মুখ ঢাকলেন। প্রিন্সের মুখ বিস্ময়ে বাঁকা, তিনি চোখ টিপলেন। অনেক অফিসারের চোখ ভিজে গিয়েছিল। বাটলার

BanglaBook.org

কজলভস্কিকে প্রায় না চিনলেও চোখের পানি বন্ধ করতে পারল না। এসব তার খুব ভালো লাগছিল।

তারপর শুরু হলো অন্যান্যের সুস্বাস্থ্য কামনা করে পান, বারিয়াতিনস্কির, ভরন্তসভের, অফিসারদের, সৈন্যদের। তারপর মাতাল অতিথিরা তাদের সামরিক অহংকার নিয়ে টেবিল ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলেন। আবহাওয়া ছিল চমৎকার, রৌদ্রোজ্জ্বল, শান্ত। মন চাঙা করা তাজা বাতাস। চারদিকে চলছিল গান ও বহ্নি উৎসব। মনে হতে পারে সবাই কোনো আনন্দ উদ্‌যাপন করছিল। বাটলার পোলতোরাৎস্কির তাঁবুতে গেল আবেগে আপ্লুত হয়ে খুব খুশিমনে। সেখানে আরও কিছু অফিসার এসেছিল, আর একটা তাসের টেবিল পাতা হয়েছিল। একজন অ্যাডজুট্যান্ট এক শ রুবল নিয়ে তহবিল খুলল। ট্রাউজারের পকেটে মানিব্যাগটা চেপে ধরে বাটলার দু-তিনবার তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভাই আর নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও সে আর খেলার প্রলোভন ঠেকাতে পারল না। বাজি ধরতে শুরু করল সে। একটি ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই সে টেবিলে দুই কনুই তুলে বসে তাসের নিচে লেখা বাজির টাকার হিসাবের দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে দেখে। ইতিমধ্যে এত হেরেছে যে সে হিসাব করতেই ভয় পাচ্ছে। কিন্তু সে হিসাব না করেই জানত সে যত ধার নিয়েছে, তাতে তার ঘোড়াটি দিয়ে দিলেও অপরিচিত অ্যাডজুট্যান্টকে টাকা শোধ করতে পারবে না। বাটলার তারপরও খেলা চালিয়ে যেত। কিন্তু অ্যাডজুট্যান্ট হঠাৎ উঠে গিয়ে বাটলারের হারের হিসাব করে ফেলল। বিভ্রান্ত বাটলার তখনই সব টাকা দিতে না পারার জন্য নানা রকম অজুহাত দেখাতে শুরু করল। বলল সে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেবে। এ কথা বলার সময় সে দেখল সবাই তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু সবাই, এমনকি পোলতোরাৎস্কি, তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া এড়িয়ে যাচ্ছে। সেটাই ছিল সেখানে তার শেষ সন্ধ্যা। তার উচিত ছিল না খেলে ভরন্তসভদের তাঁবুতে যাওয়া। তারাই তাকে দাওয়াত দিয়েছিল, তাহলে সবকিছুই ঠিক থাকত। এখন সবকিছু ঠিক তো নয়ই, ভয়ংকর হয়ে গিয়েছে।

বন্ধু ও পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায়। ঘুমাল টানা আঠারো ঘণ্টা। খুব বড় হারের পর এমন ঘুমানোই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আসা কসাক সৈন্যটিকে বখশিশ দিতে পঞ্চাশ কোপেক ধার নেওয়ায় আর তার বিধ্বস্ত চেহারা ও সংক্ষিপ্ত জবাব থেকে মেরি দমিত্রিয়েভনা আন্দাজ করতে পারছিল সে জুয়ায় অনেক টাকা হেরেছে। মেরি খেপে গেল মেজরের ওপর, কেন সে ছুটি দিয়েছিল।

BanglaBook.org

পরদিন দুপুরে ঘুম ভাঙল বাটলারের। মনে পড়ল তার অবস্থা। সে আবার বিস্মরণে ডুবে যেতে চাইল, যা থেকে কেবলই উঠেছে। কিন্তু সেটা ছিল অসম্ভব। অপরিচিত লোকটির কাছে ঋণের চার শ সত্তর রুবল শোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। তার প্রথম পদক্ষেপ ভাইয়ের কাছে চিঠি লেখা। দোষ স্বীকার করে অনুনয় করল শেষবারের মতো পাঁচ শ রুবল ধার দেওয়ার। তাদের যৌথ মালিকানার কারখানায় তার অংশ বন্ধক রেখে। তারপর চিঠি লিখল তাদের এক কিপটে আত্মীয়কে। যেকোনো সুদেই হোক পাঁচ শ রুবল ধার চাইল সেই মহিলার কাছে। তারপর সে গেল মেজরের কাছে। সে জানত মেজরের, অর্থাৎ মেরি দমিত্রিয়েভনার কিছু টাকা আছে। পাঁচ শ রুবল ধার চাইল সে।

'আমি তোমাকে এক্ষুনি দেব, কিন্তু মারিয়া দেবে না!' বলল মেজর। 'মেয়েদের মুঠো এমন শক্ত, কোন শয়তান তাদের বুঝতে পারে?...কিন্তু তোমার তো একটা উপায় করতে হবে!...ওই পাষাণ ক্যানটিনওয়ালার কাছে কিছু নেই?'

ক্যানটিনওয়ালার কাছে ধার চাওয়ার কোনো মানে নেই। তাই বাটলারের মুক্তি আসতে পারে একমাত্র উপায় ভাইয়ের বা কিপটে আত্মীয়ের কাছ থেকে।

২২

চেচনিয়ায় উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় হাজি মুরাদ তিবলিসে ফিরে আসেন। সেখানে প্রতিদিন ভরন্তসভের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কখনো দেখা পেলে ভাইসরয়ের কাছে অনুনয় করেন সব পাহাড়ি বন্দীকে এক জায়গায় এনে তার পরিবারের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য। তিনি বলেন, সেটা না করা পর্যন্ত তার হাত বাঁধা। শামিলকে ধ্বংস করার জন্য তিনি রুশদের সাহায্য করতে চান, কিন্তু পারছেন না। ভরন্তসভ ভাসা-ভাসা কথা দেন, তিনি যা পারবেন করবেন। এই বলে তা থামিয়ে দেন। বলেন জেনারেল আরগুতিনস্কি তিবলিসে পৌছালে বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন।

তারপর হাজি মুরাদ ট্রান্সককেশীয়ার ছোট্ট নুখা শহরে কিছুদিন থাকার অনুমতি চান। তিনি ভাবছেন, শামিলের কাছ থেকে তার পরিবারকে মুক্ত

BanglaBook.org

করার আলোচনা চালাতে সেখান থেকে সুবিধা হবে। তার ওপর নুখা একটা মুসলমান শহর। সেখানে মসজিদ আছে। তার নামাজ এবং ধর্মীয় কাজেও সুবিধা হবে। ভরন্তসভ বিষয়টি পিটার্সবার্গে জানান। কিন্তু তার আগেই হাজি মুরাদকে নুখা যাওয়ার অনুমতি দেন।

ভরন্তসভ, পিটার্সবার্গের কর্তৃপক্ষ এবং হাজি মুরাদের ইতিহাস যারা জানেন, তাদের কাছে পুরো ঘটনাটা ককেশীয় যুদ্ধের সৌভাগ্যসূচক পরিবর্তন। না হলেও মজার একটা ঘটনা। আর হাজি মুরাদের কাছে এটা (বিশেষ করে শেষ দিকে) তার জীবনের এক ভয়ানক সংকট। তিনি পাহাড় থেকে পালিয়েছেন কিছুটা নিজেকে বাঁচানোর জন্য। কিছুটা শামিলের প্রতি ঘৃণায়। পালানোটা কষ্টকর হলেও তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বর্তমানে তিনি তার সাফল্যে খুশি। শামিলকে আক্রমণের একটা পরিকল্পনাও তিনি করে ফেলেছেন। কিন্তু তার পরিবারকে উদ্ধারের বিষয়টাকে যতটা সহজ ভেবেছিলেন, দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি কঠিন।

শামিল তার পরিবারকে বন্দী করে রেখেছে। মহিলাদের ভিন্ন গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। তার ছেলেকে অন্ধ করে ফেলার বা হত্যা করার কথা বলেছে। তিনি নুখা গেছেন দাগেস্তানে তার অনুসারীদের নিয়ে জোর বা বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের উদ্ধারের চেষ্টায়। নুখায় তার সঙ্গে দেখা করে শেষ চরটি জানিয়ে গেছে দাগেস্তানে তার অনুসারী আভাররা তার পরিবারকে উদ্ধার করে রুশদের পক্ষে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই তারা ভিদেনোয় চেষ্টা করার ঝুঁকি নিচ্ছে না। তার পরিবার এখন ভিদেনোয় আটক। সেখান থেকে তাদের অন্য কোথাও নেওয়া হলে তারা চেষ্টা চালাবে। সে ক্ষেত্রে তাদের সরিয়ে নেওয়ার পথেই তারা আক্রমণ করার ওয়াদা করেছে।

হাজি মুরাদ তার বন্ধুদের জানিয়ে দিলেন যে তার পরিবারের মুক্তির জন্য তিনি তিন হাজার রুবল দেবেন।

নুখায় মসজিদ ও খানের প্রাসাদের কাছে পাঁচ কামরার একটা ছোট বাড়ি হাজি মুরাদকে দেওয়া হলো। তার দায়িত্ব পাওয়া অফিসার, দোভাষী ও ভৃত্যদেরও একই বাড়িতে থাকার জায়গা হলো। হাজি মুরাদের দিন চলল পাহাড়ি এলাকা থেকে বার্তাবাহকদের অপেক্ষায় আর অভ্যর্থনায়। মাঝেমধ্যে অনুমতি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কাছাকাছি বেরিয়ে।

২৪ এপ্রিল তেমন বেরোনো থেকে ফিরে হাজি মুরাদ খবর পেলেন, তিবলিস থেকে ভরন্তসভের পাঠানো একজন বার্তাবাহক এসেছে। অফিসারটি কী খবর এনেছে, জানার আগ্রহ থাকলেও হাজি মুরাদ যে ঘরে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং বার্তাবাহক অপেক্ষা করছিল, সেটায় গেলেন না।

BanglaBook.org

তার শোবার ঘরে গিয়ে জোহরের নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ হলে এলেন অভ্যর্থনা ও বসার ঘরে। তিবলিস থেকে আসা কর্মকর্তা কাউন্সিলর কিরিলভ জানাল, ভরন্তসভ চাচ্ছেন হাজি মুরাদ ১২ তারিখে তিবলিস গিয়ে জেনারেল আরগুতিনস্কির সঙ্গে দেখা করুন।

'ইয়াকশি!' গজগজ করে বললেন হাজি মুরাদ। কাউন্সিলর তাকে খুশি করতে পারেনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা এনেছ?'

'জি, এনেছি,' কিরিলভের জবাব।

'দুই সপ্তাহ দেরি হয়েছে,' হাজি মুরাদ প্রথমে দশ আঙুল এবং পরে চার আঙুল দেখিয়ে বোঝালেন। 'দাও এখানে!'

'এক্ষুনি দিচ্ছি,' বলে কিরিলভ তার ব্যাগের ভেতর থেকে টাকার ছোট ব্যাগটি বের করল।

'টাকা দিয়ে সে কী করবে?' রুশ ভাষায় বলল কিরিলভ। ভেবেছিল হাজি মুরাদ বুঝতে পারবেন না। কিন্তু হাজি মুরাদ বুঝেছিলেন এবং রাগতদৃষ্টিতে তাকালেন কিরিলভের দিকে। টাকা বের করতে করতে সে হাজি মুরাদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য, ফিরে গিয়ে ভরন্তসভকে হাজি মুরাদ সম্পর্কে খবর দেওয়া। দোভাষীর মাধ্যমে সে জিজ্ঞেস করল হাজি মুরাদের সেখানে ভালো লাগছে কি না। হাজি মুরাদ রেগে বেঁটেখাটো মোটা নিরস্ত্র লোকটির দিকে আড়চোখে তাকালেন। কোনো জবাব দিলেন না। দোভাষী প্রশ্নটা আবার করল।

'তাকে বলো আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না! আমাকে টাকাটা দিতে বলো!' বলে হাজি মুরাদ টাকা গোনার জন্য টেবিলে গিয়ে বসলেন। কিরিলভ টাকা বের করে দশটি করে সোনার টাকার সাতটি স্তূপ সাজাল। (হাজি মুরাদ দিনে পাঁচটি সোনার মুদ্রা পেতেন।) তারপর স্তূপগুলো হাজি মুরাদের দিকে ঠেলে দিল। তিনি টাকাগুলো তার চাপকানের পকেটে ঢুকিয়ে আচম্বিতে কিরিলভের টাক মাথায় চাটি মেরে চলে যাওয়ার ইশারা করলেন।

কাউন্সিলর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দোভাষীকে তাকে বলতে বলল তিনি যেন তার (কি) মতো কর্নেল পদমর্যাদার কারও সঙ্গে এমন ব্যবহারের দুঃসাহস না করেন। ভারপ্রাপ্ত অফিসারও তাতে সায় দিলেন। হাজি মুরাদ ঘাড় নেড়ে বোঝালেন তিনি জানেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

'তাকে নিয়ে কী করা যায়?' বলল ভারপ্রাপ্ত অফিসার। 'তিনি তো ছোরা ঢুকিয়ে দেবেন, ব্যস! কেউ এই শয়তানগুলোর সঙ্গে কথা বলতে পারে না! আমি তো দেখছি সে রেগে গেছে।'

সন্ধ্যা হতে শুরু করলে পাহাড় থেকে দুজন চর কাপড়ে চোখ পর্যন্ত ঢেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাদের হাজি

BanglaBook.org

মুরাদের কাছে নিয়ে গেল। তাদের একজন মোটাসোটা শ্যামলা তাভিলি, অন্যজন হালকা-পাতলা বুড়ো। তারা হাজি মুরাদের জন্য খুশির খবর আনেনি। যে বন্ধুরা তার পরিবারকে উদ্ধারের ভার নিয়েছিল, তারা শামিলের ভয়ে তা করবে না বলে জানিয়েছে। হাজি মুরাদকে কেউ সাহায্য করলে শামিল তাকে ভয়ংকর নির্যাতন করার হুমকি দিয়েছেন। চরদের কথা শুনে হাজি মুরাদ ভাঁজ করা দুই হাঁটুর ওপর কনুই দুটো রেখে পাগড়ি পরা মাথা নুয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিনি জানতেন, সেটাই তার শেষবারের চিন্তা। তাকে এখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবশেষে মাথা তুলে তিনি চরদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, 'যাও!'

'আমরা গিয়ে কী বলব?'

'বলবে, আল্লাহর যা ইচ্ছা হবে...যাও!'

চররা উঠে চলে গেল। হাজি মুরাদ গালিচার ওপর বসে হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'আমি কী করব? শামিলকে বিশ্বাস করে তার কাছে ফিরে যাব?' তিনি ভাবছিলেন। 'সে একটা শিয়াল, আমার সঙ্গে বেইমানি করবে। সে বেইমানি না করলেও ওই লালমুখো মিথ্যুকের কাছে নত হওয়া অসম্ভব। কারণ, আমি রুশদের কাছে আসার পর সে আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।' বাজ পাখি নিয়ে একটা তাভিলি গল্প তার মনে পড়ল। ধরা পরার পর বাজটি মানুষের সঙ্গে থাকত। কিছুদিন পর সে পাখিদের মধ্যে ফিরে যায়, পায়ে চামড়ার ঘুঙুর বেঁধে। কিন্তু অন্য পাখিগুলো সেটাকে গ্রহণ করল না। 'তোমার পায়ে যারা ঘুঙুর বেঁধেছে, তাদের কাছে ফিরে যাও!' বলল পাখিগুলো। 'আমাদের পায়ে ঘুঙুরও নেই, চামড়ার আংটাও নেই।' বাজটা নিজের বাসা ছেড়ে যেতে চাইল না, থেকে গেল। কিন্তু অন্য বাজগুলো সেটাকে সেখানে থাকতে দিতে চায়নি, তাই সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে মারল।

'তারাও আমাকে ওইভাবে ঠুকরে মারবে,' হাজি মুরাদ ভাবলেন। 'আমি কি এখানেই থেকে রুশ জারের জন্য ককেশিয়া জয় করে সুনাম, খেতাব আর টাকাপয়সা পাব?'

'সেটা হতে পারে,' ভরন্তসভের সঙ্গে আলাপ আর প্রিন্স যেসব মিষ্টি কথা বলেছেন, তা মনে করে তিনি ভাবলেন। 'কিন্তু আমাকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা না হলে শামিল আমার পরিবারকে শেষ করে ফেলবে।'

রাতটা হাজি মুরাদ না ঘুমিয়ে চিন্তা করে কাটালেন।

BanglaBook.org

২৩

মাঝরাতের দিকে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তিনি পাহাড়ে ছুটে যাবেন এবং এখনো যে আভাররা তার অনুগত, তাদের নিয়ে ভিদেনোয় আক্রমণ করবেন। উদ্ধার করে আনবেন পরিবারের সবাইকে, না হয় মৃত্যু। তাদের উদ্ধার করার পর রুশদের কাছে ফিরে যাবেন, না খুনজাখে পালিয়ে গিয়ে শামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, সেটা তিনি ঠিক করেননি। তিনি শুধু জানতেন, রুশদের কাছে থেকে পালিয়ে পাহাড়ে যেতে হবে। তিনি তক্ষুনি পরিকল্পনা কাজে লাগাতে শুরু করলেন।

বালিশের নিচ থেকে দলামোচড়া করে রাখা বেশমেত বের করে ভৃত্যদের কামরায় গেলেন। তারা হলঘরের অন্যদিকে থাকত। সেটার বাইরের দরজাটা খোলা থাকত। ঘরটায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাভেজা তাজা চাঁদের আলোয় তিনি আবৃত হলেন। তার কান ভরে গেল পাশের বাগানের কয়েকটি পাপিয়ার কাঁপা শিষে।

হলঘরটি পার হয়ে হাজি মুরাদ ভৃত্যদের ঘরের দরজা খুললেন। ঘরে কোনো আলো ছিল না। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো পড়ছিল জানালা দিয়ে। ঘরের একদিকে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার রাখা। হাজি মুরাদের চারজন ভৃত্য গালিচা বা চাদরের ওপর শুয়ে। খানেফি ঘোড়াগুলো নিয়ে বাইরে ঘুমাত। গামজালো দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ শুনে উঠে গিয়েছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে হাজি মুরাদকে দেখতে পেল। তাকে চিনতে পেরে সে আবার শুয়ে পড়ল। তার পাশেই শুয়ে ছিল এলডার। সে তড়াক করে উঠে বেশমেত পরতে শুরু করল। হাজি মুরাদ আদেশ করবেন এই ভেবে। খান মাহোমা আর বাটা ঘুমিয়েই থাকল। হাতের বেশমেতটা টেবিলের ওপর রাখলেন হাজি মুরাদ। ধপ করে একটা শব্দ হলো ওটার ভেতরে সোনাগুলো সেলাই করে রাখায়।

'এগুলোও ভেতরে দিয়ে দাও,' এলডারের হাতে সেদিন পাওয়া সোনাগুলো দিয়ে হাজি মুরাদ বললেন। সেগুলো নিয়ে এলডার তখনই চাঁদের আলোয় চলে গেল। তার খাপের নিচ থেকে একটা ছোট ছুরি নিয়ে বেশমেতের ভেতরের কাপড় খুলতে বসে গেল। গামজালো উঠে আসন করে বসে থাকল।

'গামজালো, তুমি সবাইকে রাইফেল আর পিস্তলগুলো পরীক্ষা করে দেখতে আর গুলি ভরে তৈরি করে রাখতে বলো। কাল আমরা অনেক দূরে যাব,' হাজি মুরাদ বললেন।

'আমাদের গুলি আর বারুদ আছে; সবকিছু তৈরি থাকবে,' জবাব দিল

BanglaBook.org

গামজালো, তারপর হেঁড়ে গলায় চাপা স্বরে কিছু বলল, যা বোঝা গেল না। সে বুঝতে পেরেছিল হাজি মুরাদ কেন রাইফেলগুলো গুলি ভরে প্রস্তুত করতে বলেছেন। শুরু থেকেই তার কেবল একটাই ইচ্ছা। যতগুলো সম্ভব রুশকে খুন করে বা ছোরা মেরে পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া। দিনকে দিন তার সেই ইচ্ছা বেড়েছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে হাজি মুরাদও তা-ই চাচ্ছেন। তাতেই গামজালো খুশি।

হাজি মুরাদ চলে যাওয়ার পর গামজালো সঙ্গীদের উঠিয়ে দিল। তারা চারজনই রাতভর রাইফেল, পিস্তল, চকমকি পাথর আর অন্যান্য জিনিস পরীক্ষা করল। কিছু নষ্ট হয়ে থাকলে সেগুলো বদলাল। রাইফেলে বারুদ ভরল। তৈলাক্ত কাপড়ের টুকরায় জড়ানো একেকটি গুলির জন্য বারুদের ছোট ছোট পুঁটলি বানাল। তলোয়ার আর ছোরাগুলোয় শাণ দিয়ে তাল্ল মাখিয়ে রাখল।

ভোর হওয়ার আগেই হাজি মুরাদ অজুর পানি নিতে হলঘরে এলেন। বুলবুলিগুলোর গানে সেদিন যেন উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছিল। আর তার ভৃত্যদের কামরা থেকে ছোরা ও তলোয়ার শাণ পাথরে ঘষার ছন্দময় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

চৌবাচ্চা থেকে সামান্য পানি নিয়ে হাজি মুরাদ তার ঘরের দরজার কাছে আসতেই মুরিদদের ঘর থেকে শাণের শব্দ ছাঁপিয়ে শোনা গেল খানেফির গলায় পরিচিত গানের সুর। হাজি মুরাদ শোনার জন্য থামলেন। গানের বাণী কী করে হামজাদ নামের অশ্বারোহী তার সাহসী সৈন্যদের নিয়ে রুশদের কাছ থেকে একপাল সাদা ঘোড়া দখল করে নিয়েছিল। তারপর একজন রুশ প্রিন্স তাকে ধাওয়া করে তেরেক নদী পার করে নিয়ে। বনের মতো বিশাল সেনাদল দিয়ে ঘেরাও করে ফেলে। তার পরের কথাগুলোয় রয়েছে কী করে হামজাদ ঘোড়াগুলো মেরে ফেলে। সেগুলো দিয়ে রক্তাক্ত প্রাচীর বানায়। তার আড়াল থেকে রাইফেলে গুলি, বেল্টে ছোরা আর শিরায় রক্ত থাকা পর্যন্ত তারা লড়ে যায়। মারা যাওয়ার মুহূর্তে হামজাদ আকাশে একটি পাখির ঝাঁক দেখে চিৎকার করে বলে :

'যাও পাখি উড়ে, আমাদের ঘরে ঘরে!
বলো গিয়ে মায়েদের বোনেদের,
বল গিয়ে প্রিয়তমা বধূদের,
আমরা শহীদ জিহাদে! আমাদের লাশ
কখনো রবে না শুয়ে কবরের ঘুমে!
শরীর খুবলে খাবে নেকড়ের দল,
চোখগুলো যাবে কাক-শকুনের পেটে।'

BanglaBook.org

শোকের সুরে গানটা শেষ হলে বাটা ভরাট গলায় চিৎকার করে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!' তারপর সব চুপ। কেবল বাগানে বুলবুলির চুক চুক চুক চুক গান। দরজার পেছনে পাথরে লোহা ঘষার শব্দ।

হাজি মুরাদ এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে খেয়াল করেননি কখন হাতের জগ থেকে পানি পড়ে গেছে। হুঁশ হলে মাথাটা নেড়ে আবার নিজের ঘরে ঢুকলেন। ফজর নামাজ পড়ার পর নিজের অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে বিছানায় বসলেন। তার আর কিছুই করার ছিল না। বাইরে যেতে হলে তাকে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু দিনের আলো ফোটেনি, অফিসার তখনো ঘুমিয়ে।

খানেফির গান তাকে আরেকটি গান মনে করিয়ে দিল। গানটা তার জন্মের ঠিক পরপর তার মায়ের রচনা। তার বাবার উদ্দেশে এই গানটার কথাই হাজি মুরাদ লরিস-মেলিকভকে বলেছিলেন।

'দামেস্ক ইস্পাতে গড়া তোমার তলোয়ার আমার শুভ্র বুক চিরেছিল;
অবশ্য তার পাশেই রেখেছি ছোট্ট ছেলেটিকে;
আমার উষ্ণ লহুস্রোতে ধুয়েছি তাহারে; এবং সে ক্ষত
ওষধি ও যত্ন বিনা দ্রুতই শুকায়,
মৃত্যুর মুখেও আমি ভয়হীনা, সে-ও তা-ই,
আমার বাচ্চা, অশ্বারোহী, মুক্ত থাকবে সে ভয়ডর থেকে!'

হাজি মুরাদের মনে পড়ল কেমন করে তার মা তাকে বাড়ির ছাদে চাদর মুড়ে পাশে শুইয়ে রাখতেন। তিনি কেমন করে মায়ের কাটা দাগটি দেখতে চাইতেন। হাজি মুরাদের মনে হলো তিনি মাকে সামনে দেখছেন—লোল চর্ম, পাকা চুল ফোকলা দাঁতে তিনি শেষবার যেমন দেখেন, তেমন নয়। সুন্দরী সুঠাম তরুণী পাঁচ বছরের ভারী ছেলেটিকে পিঠের ঝুড়িতে যেভাবে পাহাড়ে বাবার কাছে নিয়ে যেতেন, সেই রূপে। তার দাদার কথাও মনে হলো। চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যাওয়া, সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো তার বলিষ্ঠ হাতে রুপার ওপর হাতুড়ি দিয়ে কাজ করতেন। তাকে নামাজ পড়তে বাধ্য করতেন।

তার মনে পড়ল পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্নাটার কথা। তার লম্বা পায়জামা গুটিয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে পানি আনতে যেতেন। মনে পড়ল কৃশকায় কুকুরটার কথা, যেটা তার গাল চেটে দিত। বিশেষ করে মনে পড়ল টক দুধ আর ধোঁয়ার অদ্ভুত গন্ধ। দুধ দোয়ানো বা দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় মা তাকে চালাঘরে নিয়ে গেলে ধোঁয়ায় সেই গন্ধ পেতেন। মা প্রথমবার তার চুল কামিয়ে দেওয়ার ঘটনা তার মনে আছে। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো চকচকে পিতলের গামলায় তার ঘন নীল মাথা দেখে কী অবাকই

BanglaBook.org

না তিনি হয়েছিলেন!

নিজের ছোটবেলার স্মৃতি তাকে ছেলের কথা মনে করিয়ে দিল। ইউসুফের চুল প্রথমবার তিনিই কামিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ইউসুফ একজন সুদর্শন তরুণ অশ্বারোহী যোদ্ধা। শেষবার দেখা ইউসুফের চেহারা মনে হলো তার। হাজি মুরাদ তসেলমেস থেকে চলে আসার দিন শেষ দেখেছিলেন। তার ছেলে ঘোড়া এনে দিয়ে তার সঙ্গে আসার অনুমতি চেয়েছিল। অস্ত্রসজ্জিত ইউসুফ তার নিজের ঘোড়ায় লাগাম হাতে তৈরি ছিল। তার সুশ্রী চেহারায় গোলাপি আভা এবং ছিপছিপে লম্বা গড়ন (সে বাবার চেয়ে লম্বা) যেন শ্বাস নেয় দুঃসাহস, তারুণ্য আর জীবনের আনন্দের। কম বয়সী হলেও চওড়া কাঁধ, চিকন কোমর, বলিষ্ঠ লম্বা হাত, শক্তি, নমনীয়তা ও চলাফেরায় ক্ষিপ্রতা হাজি মুরাদকে মুগ্ধ করত।

'তুমি বরং থেকেই যাও। বাড়িতে তুমি মা, দাদিমার খেয়াল রেখো,' হাজি মুরাদ বলেছিলেন। তার মনে আছে কী তেজ, অহংকার আর আনন্দ নিয়ে ইউসুফ জবাব দিয়েছিল, জান থাকতে কেউ মা-দাদিমার ক্ষতি করতে পারবে না। ইউসুফ বাবাকে ঝরনা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে যায়। তারপর থেকে হাজি মুরাদ তার স্ত্রী, মা আর ছেলেকে দেখেননি। শামিল এই ছেলেরই চোখ তুলে নিতে চায়! তার স্ত্রীর কী হবে হাজি মুরাদ ভাবতে চাননি।

এসব চিন্তায় তিনি উত্তেজিত হয়ে আর বসতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে গেলেন, খুলে এলডারকে ডাকলেন। সূর্য তখনো ওঠেনি কিন্তু বেশ আলো। বুলবুলিগুলো তখনো ডাকছিল।

'যাও, অফিসারকে বলো আমি বাইরে যেতে চাই, আর ঘোড়ায় জিন লাগাও,' তিনি বললেন।

BanglaBook.org

২৪

এ সময় বাটলারের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যুদ্ধের কবিতা। সে শুধু কাজের সময় কবিতায় ডুবে যেত তা নয়, নিজস্ব সময়েও। চাপকান গায়ে ঘোড়ায় চড়ে সে ঘুরে বেড়াত। বোগদানোভিচের সঙ্গে দুবার গিয়েছিল ওত পাতার জায়গায়। কোনোবারই তারা কাউকে খুঁজে পায়নি বা মারেনি। সাহসী হিসেবে বোগদানোভিচের সুনাম ছিল। তার সঙ্গে বন্ধুত্বে বাটলার যুদ্ধে থাকার মতো

মজা পেত। চড়া সুদে এক ইহুদির কাছ থেকে ধার নিয়ে সে তার ঋণ শোধ করে দিয়েছিল। বরং বলা যায়, সে তার সমস্যার সমাধান না করে শুধু থামিয়ে রেখেছিল। সে তার অবস্থা চিন্তা না করার চেষ্টা করত। তাই শুধু যুদ্ধের কবিতা নয়, মদেও তা ভুলে থাকা। প্রতিদিন সে বেশি করে মদ পান করত, আর দিন দিন নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। আগে সে মেরি দমিত্রিয়েভনার প্রতি জোসেফের মতো পবিত্র ছিল। কিন্তু এখন তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটা তাকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করায় সে অবাক ও লজ্জিত।

এপ্রিলের শেষে দুর্গে একটি সেনাদল এল। বারিয়াতিনস্কি তাদের দিয়ে চেচনিয়ার সরাসরি আক্রমণ করতে চায়। এত দিন সেটা অসম্ভব মনে করা হতো। সেনাদলে কাবার্ডা রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি ছিল। ককেশীয় রীতিতে কুরিন কোম্পানিগুলো তাদের মেহমান হিসেবে যত্ন করত। সৈন্যদের থাকতে দেওয়া হলো ব্যারাকে। রাতের খাবারে বাজরার পরিজের সঙ্গে দেওয়া হলো ভোদকা। অফিসাররা কুরিন অফিসারদের বাড়িতে জায়গা পেল। স্বভাবতই সেই সঙ্গে রাতের খাবারও। ডিনারে রেজিমেন্টের গায়ক দল গাইল। তা শেষ হলো মদ্যপান দিয়ে। মেজর পেত্রভ আর রক্তিমাভ ছিল না, ফ্যাকাশে ছাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে একটা চেয়ারে বসা। তলোয়ার বের করে কাল্পনিক শত্রুকে এফোঁড়-ওফোঁড় করছিল। মুখে কখনো খিস্তি আর কখনো হাসি। কখনো কাউকে জড়িয়ে ধরছে আবার কখনো নাচছে প্রিয় গানের সুরে।

'শামিল হাঙ্গামা করেছে
পেছনের দিনগুলোয়;
টারা রা রা টা টা
পেছনের বছরগুলোয়!'

বাটলারও সেখানে ছিল। এই গানেও সে যুদ্ধের কবিতা খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনের গভীরে মেজরের জন্য তার খারাপ লাগছিল। কিন্তু তাকে থামানো ছিল অসম্ভব। মাথাটা ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে অনুভব করে বাটলার নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে বাসায় চলে গেল।

চাঁদের আলোয় সাদা বাড়িগুলো আর রাস্তার পাথরগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। প্রতিটা নুড়ি, খড় আর ছোট ছোট ধুলার ঢিপি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাসার কাছাকাছি গেলে বাটলারের দেখা হলো মেরি দমিত্রিয়েভনার সঙ্গে। তার মাথা ও ঘাড়ে একটা শাল জড়ানো। মেরির কাছে ছেঁকা খাওয়ার পর বাটলার লজ্জায় তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু চাঁদের আলো আর পেটে মদের কারণে তাকে দেখে বাটলার খুশি। আবার ভাব জমাতে ইচ্ছা হলো তার।

BanglaBook.org

'কোথায় যাচ্ছ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, আমার বুড়োর খোঁজে,' মিষ্টি করে জবাব দিল মেরি। বাটলারকে সে সত্যি সত্যি প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু তাকে বাটলারের এড়িয়ে চলা সে পছন্দ করেনি।

'তার জন্য ভাবছ কেন? সে শিগগিরই চলে আসবে।'

'আসলেই কি আসবে?'

'সে না এলে তারা নিয়ে আসবে।'

'এই অবস্থা...এটা তো ভালো না!...তুমি বলছ আমার না যাওয়াই ভালো?'

'না, যেয়ো না। তার চেয়ে বাড়ি চলো।'

মেরি দমিত্রিয়েভনা ফিরে তার পাশাপাশি হেঁটে চলল। চাঁদের দারুণ উজ্জ্বল আলোয় মনে হচ্ছিল তাদের মাথার ছায়ার চারপাশে দুটো আলোর বলয় চলছে। বর্তিকা দুটোর দিকে তাকিয়ে বাটলার ভাবছিল, আবার বলবে সে মেরিকে কত পছন্দ করে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে, বুঝতে পারছিল না। মেরি তার কথা শোনার জন্য চুপ করে ছিল। তাই তারা কোনো কথা না বলে বাড়ির কাছে চলে এসেছে। সে সময় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দেখতে পেল। একজন অফিসার কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

'তোমারা কারা?' পাশে সরে মেরি দমিত্রিয়েভনা জিজ্ঞেস করল। চাঁদটা ঘোড়সওয়ারদের পেছন দিকে থাকায় তারা বাটলার ও তার কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাদের চিনতে পারেনি।

'তুমি কি পিটার নিকোলায়েভিচ?' আগন্তুককে মেরির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আমি,' কামিনেভ বলল। 'আহ্, বাটলার, কেমন আছ?...এখনো ঘুমাওনি? মেরি দমিত্রিয়েভনার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছ! সাবধান, মেজর কিন্তু তোমাকে দেখিয়ে দেবে।...কোথায় সে?'

'কোথায় আবার, ওই ওখানে...শোনো!' মেরি দমিত্রিয়েভনা জবাব দিল নাগড়া বাজার শব্দের দিকে আঙুল দেখিয়ে। 'তারা আমোদ-ফুর্তি করছে।'

'কী জন্য? তোমাদের লোকেরা কি নিজেরা নিজেরাই ফুর্তি করে?'

'না। হাসাভ-ইয়ার্ট থেকে কয়েকজন অফিসার এসেছে। তাদের আদর-যত্ন করা হচ্ছে।'

'ভালোই হলো! আমি ঠিক সময়ে এসেছি...মেজরের সঙ্গে আমার একটু দেখা করা দরকার।'

'কোনো কাজে?' বাটলার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ছোট্ট একটা কাজ।'

BanglaBook.org

'ভালো না খারাপ?'

'সেটা নির্ভর করে।...আমাদের জন্য ভালো, কিছু লোকের জন্য খারাপ,' বলে হাসল কামিনেভ।

তারা ইতিমধ্যে মেজরের বাসার পৌঁছেছে।

'শিখিরেভ,' চিৎকার করে একজন কসাককে ডাকল কামিনেভ, 'এখানে এসো।'

সঙ্গের কসাকরা ছিল ডন অববাহিকার। তাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এল। পরনে সাধারণ ডন কসাকদের উর্দি, লম্বা বুট, গলায় বাঁধা লম্বা পশমি জোব্বা, কাঁধে ব্যাগ।

কামিনেভ নেমে ঘোড়াটা নিয়ে যেতে বলল।

কসাক সৈন্যটিও ঘোড়া থেকে নেমে ব্যাগ থেকে একটা থলে বের করল। কামিনেভ থলেটা তার কাছে থেকে নিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল।

'বেশ, আমি তোমাদের একটা নতুন জিনিস দেখাব! ভয় পেয়ো না মেরি দমিত্রিয়েভনা?'

'আমি কেন ভয় পাব?'

'এই দেখো!' বলে কামিনেভ থলে থেকে একটা মানুষের মাথা বের করল। চাঁদের আলোয় ওটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা চিনতে পেরেছ?'

ওটা ছিল একটা ন্যাড়া মাথা, মোটা ভুরু, ছোট করে ছাঁটা কালো দাড়ি ও গোঁফ, এক চোখ খোলা, অন্যটা আধবোজা। ন্যাড়া মাথাটায় চিড় ধরা কিন্তু সোজা নয়, নাকে জমাট রক্ত। ঘাড়টা রক্তমাখা তোয়ালে দিয়ে প্যাঁচানো। নীল ঠোঁট শিশুর মতো দয়ালু অভিব্যক্তি ধরে আছে।

মেরি দমিত্রিয়েভনা মাথাটার দিকে তাকিয়েই দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

বাটলার বীভৎস মাথাটা থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। ওটা ছিল সেই হাজি মুরাদের মাথা, যার সঙ্গে কয়েক দিন আগেই বন্ধুর মতো মিশেছে।

'এটা কেমন করে হলো? কে তাকে খুন করেছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়,' বলে কামিনেভ মাথাটা কসাক সৈন্যটার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বাটলারের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

'সে বীরের মতো মরেছে,' কামিনেভ বলল।

'কিন্তু এত সব ঘটল কীভাবে?'

BanglaBook.org

'একটু দাঁড়াও। মেজর আসুক। সবই বলব। আমাকে এই জন্যই পাঠানো হয়েছে। সব কটি দুর্গ আর গ্রামে এটা দেখাতে হবে।'

মেজরকে খবর পাঠানো হলো। সে তার মতোই মাতাল আরও দুজন অফিসারের সঙ্গে এসে কামিনেভকে জড়িয়ে ধরল।

'আমি হাজি মুরাদের মাথাটা নিয়ে এসেছি,' বলল কামিনেভ।

'না?...খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পালাতে চেয়েছিল।'

'আমি সব সময় বলেছি সে ধোঁকা দিতে এসেছে!...কোথায় সেটা? মানে মাথাটা আমি দেখতে চাই।'

কসাক সৈন্যটাকে ডাকা হলো। সে মাথাসহ ব্যাগটা আনল। মাথাটা বের করার পর মেজর মাতাল চোখে ওটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

'সব আগের মতো আছে, সে ভালো মানুষ ছিল,' বলল মেজর। 'আমি তাকে চুমু দিতে চাই।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটা এক বীরের মাথা,' বলল অফিসারদের একজন।

সবাই মাথাটা দেখার পর সৈন্যটার কাছে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া হলো। মেঝেয় যত কম সম্ভব লাগিয়ে যত্ন করে সে মাথাটা ব্যাগে ঢোকাল।

'কামিনেভ, আমার প্রশ্ন, মাথাটা দেখানোর সময় তুমি কী বলো,' একজন অফিসার প্রশ্ন করল।

'না!...আমাকে তাকে চুমু দিতে দাও। সে আমাকে একটা তলোয়ার দিয়েছে!' চিৎকার করে বলল মেজর।

বাটলার বের হয়ে এল গাড়িবারান্দায়।

সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে মেরি দমিত্রিয়েভনা বসে ছিল। সে ঘুরে একবার বাটলারের দিকে তাকাল, তারপর রেগে ঘুরে বসল।

'কী হয়েছে, মেরি দমিত্রিয়েভনা?' বাটলার জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা সবাই খুনি!...আমি এসব ঘেন্না করি! সত্যিই তোমরা খুনি,' বলে উঠে গেল সে।

'যে কারও জীবনে এটা ঘটতে পারে,' কী বলছে না বুঝে বাটলার মন্তব্য করল। 'এটাই যুদ্ধ।'

'যুদ্ধ! আসলেই, যুদ্ধ!...খুনির দল আর কিছু না। একটা লাশ মাটির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। আর তারা সেটা নিয়ে আমোদ করছে!...আসলেই গলাকাটা খুনি,' বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে সে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

BanglaBook.org

বাটলার ফিরে গেল ঘরে, কামিনেভকে কীভাবে এটা ঘটল তা বিস্তারিত বলতে বলল

এবং কামিনেভ সব বলল।

ঘটনাটা পরের অধ্যায়ে।

২৫

শহরেই আশপাশে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি ছিল হাজি মুরাদের। তবে সঙ্গে সব সময়ই একদল কসাক সৈন্য রাখতে হবে। নুখায় কসাক সৈন্যের সংখ্যা সাকল্যে পঁচিশ। তাদের প্রায় অর্ধেকই ছিল আবার অফিসারদের কাজে। বাকিদের মধ্য থেকে দশজনকে হাজি মুরাদের সঙ্গে দেওয়ার আদেশ পালন করতে হলে একই দলকে এক দিন পরপর একই কাজ করতে হতো। তাই প্রথম দিন দশজন দেওয়া হলেও ভবিষ্যতে তা পাঁচে নামানোর সিদ্ধান্ত হয়। আর হাজি মুরাদকে তার লোকদের সবাইকে সঙ্গে না নিতে বলা হয়। কিন্তু ২৫ এপ্রিল তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে বের হন। তিনি ঘোড়ায় চড়লে তার পাঁচ সহকারীও সঙ্গে চলল। তাই দেখে কমান্ডার বলে যে তিনি তাদের সবাইকে নিতে পারেন না। কিন্তু হাজি মুরাদ না শোনার ভান করে ঘোড়া চালিয়ে দেন। কমান্ডার আর জোর করেনি।

কসাক দলের সঙ্গে একজন নিম্নপদস্থ অফিসার (এনসিও) ছিল। সাহসিকতার জন্য নাজারভ সেন্ট জর্জেস ক্রস পদক পেয়েছিল। সে ছিল গোলাপের মতো টাটকা এক বাদামি চুলের তরুণ। এক দরিদ্র গোঁড়া খ্রিষ্টান পরিবারের বড় ছেলে। পিতৃহীন অবস্থায় সে বড় হয়। বুড়ি মা, তিনটি বোন আর দুই ভাই নিয়ে তার পরিবার।

'নাজারভ, তার কাছাকাছি থেকো!' কমান্ডার চিৎকার করে আদেশ দিল।

'ঠিক আছে, স্যার!' বলে নাজারভ ঘোড়ায় উঠে পিঠের রাইফেলটা ঠিক করে নিল। তার দুরঙা বড় খোজা ঘোড়াটা জোর কদমে চালিয়ে দিল। তার পিছে পিছে চলল চারজন কসাক: লম্বা ছিপছিপে থেরাপন্তভ, পেশায় চোর আর লুটেরা। (সে-ই গামজালোর কাছে বারুদ বিক্রি করেছিল।) সুঠামদেহী চাষি ইগ্নাতভ। যে নিজের গায়ের জোর নিয়ে বড়াই করত। সেনাবাহিনীতে তার বাধ্যতামূলক চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সে আর তরুণ ছিল না। মিশকিন ছিল কমজোর। সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। আর ছিল

BanglaBook.org

মায়ের একমাত্র ছেলে সুন্দর চুলের পেত্রাকভ। সব সময় অমায়িক আর আমুদে।

সকালটা কুয়াশাঢাকা হলেও পরে পরিষ্কার হয়ে যায়। পাতার কলি, কুমারীর মতো নতুন গজিয়ে ওঠা দূর্বা, কচি ভুট্টার মোচা এবং রাস্তার বাঁ দিকে তরতর করে বয়ে চলা নদীর ছোট ছোট ঢেউ কেবল দেখা যাচ্ছিল। সবই কাঁচা রোদে চকচক করছিল।

হাজি মুরাদ ধীরে ধীরে চলছিলেন। তার পিছু পিছু কসাকরা আর তার সহকারীরা। রাস্তাটি ধরে হেঁটে হেঁটে তারা দুর্গটা ছাড়িয়ে গেলেন। রাস্তায় দেখতে পেলেন মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে, সৈন্যরা ঘোড়ার গাড়ি চালাচ্ছে আর মহিষগুলো ক্যাঁচক্যাঁচে গাড়ি টেনে চলেছে। মাইল দেড়েক যাওয়ার পর হাজি মুরাদ তার সাদা কাবার্ডা জাতের ঘোড়াটা একটু জোরে চালালেন। তার সঙ্গে থাকতে কসাক ও সহকারীদের ঘোড়া দুলকি চালে চালাতে হলো।

'বাহ্, কী সুন্দর তার ঘোড়াটা। সে যদি এখনো শত্রু থাকত, তাহলে আমি তাকে গুলি করে ফেলে দিতাম!' বলল থেরাপন্তভ।

'ঠিকই বলেছ। তিবলিসে ঘোড়াটার জন্য তিন শ রুবল দিতে চেয়েছিল।'

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে আমি তার আগে চলে যেতে পারি,' নাজারভ বলল।

'তাই মনে করো!'

হাজি মুরাদ আরও জোরে চলছিলেন।

'বন্ধু, ওইভাবে যাবেন না। দাঁড়ান!' চিৎকার করে বলে নাজারভ হাজি মুরাদকে কাটিয়ে যেতে শুরু করল।

হাজি মুরাদ পিছে তাকালেন। কিছু না বলে একই রকম জোরে যেতে থাকলেন।

'দেখো, শয়তানগুলো কিছু একটা করবে!' বলল ইগ্নাতভ। 'তারা দূরে সরে যাচ্ছে।'

তারা পাহাড়ের দিকে প্রায় এক মাইল চলে এসেছে।

'আমি বলে দিচ্ছি এতে কোনো কাজ হবে না!' চিৎকার করে বলল নাজারভ।

হাজি মুরাদ উত্তর দিলেন না, ফিরেও তাকালেন না। শুধু ঘোড়াটা আরও জোরে ছোটালেন।

'ধোঁকাবাজ! তোমাকে যেতে দেব না!' চিৎকার করে নাজারভ বুটের আল দিয়ে ঘোড়াটাকে খোঁচা দিল। দুরঙা খোজা ঘোড়াটায় চাবুক মেরে পাদানিতে ভর দিয়ে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে হাজি মুরাদকে ধরতে ছুটল।

BanglaBook.org

উজ্জ্বল আকাশ আর পরিষ্কার বাতাসে নাজারভের বুক ভরে গেল এক খেলার আনন্দে। কারণ, তার সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়াগুলোর একটায় মসৃণ পথে সে হাজি মুরাদকে ধাওয়া করছিল। ওই আনন্দের কারণে তার মনে কোনো দুঃখজনক বা ভয়ানক ঘটনার চিন্তা আসেনি। প্রতি কদমেই সে হাজি মুরাদের কাছে চলে আসছিল বলে সে খোশমেজাজে ছিল।

তার পেছনে বড় ঘোড়াটার খুরের আওয়াজ থেকে হাজি মুরাদ হিসাব করলেন কতক্ষণে সেটা তাকে কাটিয়ে যাবে। তিনি ডান হাত দিয়ে পিস্তলটা ধরলেন আর বাঁ হাতে রাশ টেনে তার কাবার্ডা ঘোড়াটার গতি কমিয়ে আনলেন। পেছনে আরেকটা ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে ওটা উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল।

'আমি বলছি, আপনি এ রকম করবেন না!' হাজি মুরাদের ঘোড়াটার লাগাম ধরার জন্য বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে নাজারভ চিৎকার করে বলল। কিন্তু সেটা ধরার আগেই একটা গুলি ছোড়া হলো। 'আপনি কী করছেন,' বুকে হাত চেপে নাজারভের চিৎকার। 'ছেলেরা, এদের আটকাও!' চিৎকার করে সে উপুড় হয়ে জিনে চড়ার হাতলটার ওপর পড়ে গেল।

কিন্তু পাহাড়িরা আগেই তাদের হাতিয়ার তুলে নিয়ে কসাকদের ওপর পিস্তলের গুলি চালায় আর তলোয়ার দিয়ে কোপায়।

নাজারভ তার ঘোড়াটার ঘাড়ে ঝুলে থাকল। ঘোড়াটা তার সঙ্গীদের চারপাশে ঘুরছিল। ইগ্নাতভ আর দুজন পাহাড়ির পা দলে তার ঘোড়াটা পড়ে গেল। কিন্তু পাহাড়িরা না নেমেই তলোয়ার বের করে ইগ্নাতভের মাথা আর হাতে কোপ মারে। পেত্রাকভ সহযোদ্ধাদের উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই দুটো গুলি লাগল তার পিঠে ও পাশে। সে একটা বস্তার মতো ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

মিশকিন ঘোড়া ঘুরিয়ে জোর কদমে ছুটল দুর্গের দিকে। খানেফি আর বাটা তাকে ধাওয়া করে কিন্তু সে ততক্ষণে এত দূর চলে গিয়েছিল যে তাকে ধরতে পারল না। তাই তারা অন্যদের কাছে ফিরে এল।

পেত্রাকভ পড়ে ছিল চিত হয়ে। তার পেট কেটে ভুঁড়ি বের হয়ে এসেছে। তার কচি মুখটা আকাশের দিকে, মারা যাওয়ার আগে সে মাছের মতো শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

ইগ্নাতভকে তলোয়ার দিয়ে শেষ করে গামজালো নাজারভের ওপরও একটা কোপ দিল। মৃতদের শরীর থেকে গুলির থলিগুলো খুলে নিল বাটা। খানেফি নাজারভের ঘোড়াটা নিতে চাইল কিন্তু হাজি মুরাদ তাকে বারণ করলেন এবং রাস্তা ধরে এগোতে থাকলেন। মুরিদরা তাকে অনুসরণ করল। নাজারভের ঘোড়াটা তাদের সঙ্গে আসছিল কিন্তু তারা ওটাকে খেদিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

তারা ইতিমধ্যে নুখা থেকে ছয় মাইল চলে এসেছে। ধানখেতের মধ্য দিয়ে চলছে। তখন দুর্গের কামান থেকে সতর্কতার সংকেত হিসেবে একটা গোলা দাগা হলো।

'হায় হায়! হায় খোদা! এটা তারা কী করল?' হাজি মুরাদের পালানোর খবর শুনে দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে দুর্গের কমান্ডার চিৎকার করতে থাকল। 'তারা আমার সর্বনাশ করেছে! তারা তাকে পালাতে দিয়েছে, পাজি শয়তানগুলো!' মিশকিনের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে তার হা-হুতাশ।

সব জায়গায় বিপৎসংকেত দেওয়া হলো। শুধু সেখানকার কসাকই না, রুশপন্থী গ্রামগুলো থেকে যত যোদ্ধা পাওয়া গেল, সবাইকে পলাতকদের খুঁজতে লাগানো হলো। হাজি মুরাদকে জীবিত বা মৃত ধরে আনার জন্য এক হাজার রুবল পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। কসাকদের কাছ থেকে হাজি মুরাদ আর তার সঙ্গীরা পালানোর দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই শ অশ্বারোহী ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অধীনে পলাতকদের ধরার জন্য বের হলো।

রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল যাওয়ার পর হাজি মুরাদ তার হয়রান ঘোড়াটার অবস্থা দেখলেন। সাদা ঘোড়াটা ঘেমে ছাইরং হয়ে গিয়েছে।

রাস্তার ডান দিকে বেলারঝিক গ্রামের বাড়িগুলো আর মিনার দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে কিছু খেত, তারপরই নদী। পাহাড়গুলো ডান দিকে হলেও হাজি মুরাদ উল্টো বাঁ দিকে চলতে শুরু করলেন। ভাবলেন, তাকে ধরতে সৈন্যরা অবশ্যই ডান দিকে যাবে। আর তিনি বড় রাস্তা ছেড়ে আলাজান পার হয়ে অপর দিকের বড় রাস্তায় পড়বেন। যেখানে তার যাওয়ার কথা কেউ ভাববে না। ওই রাস্তা ধরে বনের পাশ দিয়ে গিয়ে নদীটা আবার পার হয়ে পাহাড়ের পথ ধরবেন।

এই ভেবে তিনি বাঁ দিকে ঘুরলেন। কিন্তু নদীর কাছে যাওয়া অসম্ভব। ধানখেতগুলো বসন্তকালের বন্যায় ডুবে গেছে। ঘোড়ার খুর কাদায় দেবে যাচ্ছে। হাজি মুরাদ ও তার সঙ্গীরা কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে ঘুরছেন একটু শুকনা মাটির আশায়। কিন্তু খেতগুলো সবখানেই ডুবেছে। কাদার গর্ত থেকে ঘোড়াগুলো খুর টেনে ওঠানোর সময় বোতলের ছিপি খোলার মতো পপ পপ শব্দ হচ্ছে। ওগুলো কয়েক কদম পরপর হাঁপিয়ে থেমে যাচ্ছে। এইভাবে সন্ধ্যা নেমে আসা পর্যন্ত তারা নদীর কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। তাদের বাঁ দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটু উঁচু জায়গা দেখে হাজি মুরাদ ঠিক করলেন সেখানে রাত পর্যন্ত থাকবেন। ঘোড়াগুলো যাতে জিরিয়ে নিতে পারে। তারা সঙ্গে আনা রুটি আর পনির খেয়ে নিলেন। শেষ পর্যন্ত রাত নেমে এল। চাঁদটা প্রথমে উজ্জ্বল আলো দিলেও পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেল। আবার অন্ধকার।

BanglaBook.org

এলাকাটায় অসংখ্য বুলবুলি। তাদের ঝোপটাতেও দুটো ছিল। মানুষগুলো কথা বলার সময় ওগুলো কোনো শব্দ করেনি। কিন্তু তারা চুপ করলে বুলবুলিগুলো ডাকতে শুরু করল।

জেগে জেগে রাতের সব রকম শব্দ শুনছিলেন হাজি মুরাদ। পাখির গানের কাঁপা সুরে তার মনে এল হামজাদকে নিয়ে গানটি। আগের রাতে পানি আনতে গিয়ে তিনি যেটা শুনেছিলেন। মনে হলো তার নিজের অবস্থাও সে রকম। তিনি সেটাই চাইলেন। চট করে তার মন বদলে গেল। চাদর বিছিয়ে নামাজ পড়লেন তিনি। নামাজ শেষ না করতেই শুনতে পেলেন একটা শব্দ তাদের দিকে আসছে। সেটা ছিল বানে ডোবা খেতের মধ্য দিয়ে আসা অনেকের পায়ের শব্দ।

হুঁশিয়ার বাটা ঝোপটার কিনারে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কিছু ছায়া দেখতে পেল। হেঁটে আর ঘোড়ায় চড়ে কিছু লোক আসছে। খানেফিও অন্যদিকে সে রকম লোকদের দেখতে পেল। ওই জেলার সেনা কমান্ডার কারগানভ তার আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে আসছে।

হাজি মুরাদ ভাবলেন, 'তাহলে আমরা হামজাদের মতোই লড়ব।'

বিপৎসংকেত পেয়ে কারগানভ তার আধা সামরিক আর কসাক সৈন্যদের দল নিয়ে হাজি মুরাদকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সারা দিনে তার কোনো চিহ্নও পায়নি। আশা ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে সে একটা বুড়ো লোককে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়ায় চড়া কোনো লোককে যেতে দেখেছে কি না। বুড়ো বলল দেখেছে। ছয়জন লোককে পথ ভুল করে ধানখেতের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছে। সে যেই জঙ্গলটা থেকে লাকড়ি কুড়াচ্ছিল, সেখানেই তাদের ঢুকতে দেখেছে। কারগানভ ঘুরে বুড়ো লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। বাঁধা ঘোড়াগুলো দেখে সে নিশ্চিত হলো, হাজি মুরাদ সেখানেই। রাতে সে ঝোপটাকে ঘিরে রাখল, যাতে সকালে হাজি মুরাদকে জীবিত বা মৃত ধরতে পারে।

ঘেরাও হয়ে গেছেন বুঝতে পেরে আর ছোট ছোট গাছের মধ্যে একটা খন্দক দেখতে পেয়ে হাজি মুরাদ সেটায় নেমে গেলেন। ঠিক করলেন, শক্তি আর গুলি থাকা পর্যন্ত লড়বেন। সঙ্গীদের তিনি তা বলে গর্তটার সামনে একটা বাঁধ দিতে বললেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল। ডালপালা কেটে ফেলল আর ছোরা দিয়ে মাটি তুলে একটা পরিখা খুঁড়ল। হাজি মুরাদ নিজেও তাদের সঙ্গে হাত লাগালেন।

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের কমান্ডার ঝোপটার কাছে এসে চিৎকার করে বলল,

BanglaBook.org

'হাজি মুরাদ, হার মানো। আমরা অনেক, তোমরা মাত্র কয়েকজন!'

জবাবে এল রাইফেলের একটা গুলি। আর গর্তটা থেকে ধোঁয়ার একটা রেখা উঠল। গুলিটা কমান্ডারের ঘোড়ায় লাগে। ঘোড়াটা তার নিচে টাল খেয়ে পড়ে যায়। সৈন্যদের তরফে শুরু হলো পাল্টা গুলির বৃষ্টি। শাঁই শাঁই করে তাদের গুলিগুলো পাতা আর ছোট ছোট ডাল ভেঙে ফেলল। কিছু গিয়ে লাগল গর্তটার বাঁধে। কিন্তু সেটার আড়ালে কারও গায়ে লাগেনি। অন্যগুলোর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ায় গামজালোর ঘোড়াটার মাথায় একটা গুলি লাগে। ওটা পড়ে না গিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে অন্যগুলোর কাছে যায়। ওটার রক্তে ঘাস ভিজে যায়। হাজি মুরাদ আর তার সঙ্গীরা কোনো সৈন্য কাছে এলেই কেবল গুলি করে আর তাদের নিশানা ব্যর্থ হয় খুব কম। তিনজন সৈন্য আহত হয়। আর অন্যরা পরিখার কাছে না গিয়ে ক্রমেই পিছু হটতে থাকে আর দূর থেকে দিগ্‌বিদিক গুলি করতে থাকে।

এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এমন চলল। সূর্য গাছগুলোর মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠেছে। হাজি মুরাদ তার ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে নদীর দিকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। তখনই আরও অনেক লোক আসায় তাদের গোলমালের শব্দ শোনা গেল। মেখতুলির হাজি আগা তার লোকদের নিয়ে এসেছিল। প্রায় দুই শ জন। হাজি আগা একসময় হাজি মুরাদের মিত্র ছিল এবং পাহাড়ে তার সঙ্গেই থাকত। কিন্তু পরে সে রুশদের পক্ষে চলে যায়। তার সঙ্গে ছিল হাজি মুরাদের পুরোনো শত্রুর ছেলে আহমেদ খান।

কারগানভের মতো হাজি আগাও হাজি মুরাদকে হার মেনে নিতে বলে। হাজি মুরাদও আগের মতোই গুলি ছুড়ে জবাব দেয়।

'তলোয়ার হাতে নাও!' চিৎকার করে আদেশ দিয়ে হাজি আগা নিজেরটাও বের করে। প্রায় এক শ লোক তীব্র চিৎকার করে তলোয়ার নিয়ে ঝোপের মধ্যে হামলা করে।

হাজি আগার যোদ্ধারা ঝোপের মধ্যে দৌড়াতে থাকে আর পরিখা থেকে একটার পর একটা গুলিও আসতে থাকে। তিনজন পড়ে যাওয়ার পর হামলাকারীরা ঝোপে ঢোকা বন্ধ করে বাইরে থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করল। গুলি করতে করতে তারা ধীরে ধীরে পরিখার দিকে এগোতে শুরু করে এক ঝোপের আড়াল থেকে আরেক ঝোপে দৌড়ে গিয়ে। কেউ কেউ তা করতে পারল। অনেকে হাজি মুরাদ ও তার সঙ্গীদের গুলিতে মারা পড়ল। হাজি মুরাদের কোনো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, গামজালোর গুলিও খুব কমই নষ্ট হয়। যতবার তার গুলিতে কেউ পড়ে যায়, ততবারই সে আনন্দে চিৎকার

BanglaBook.org

করে ওঠে। খান মাহোমা পরিখার কিনারে বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!' পড়ছিল আর মাঝেমধ্যে গুলি করছিল। কিন্তু সেগুলো প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এলডার ছোরা হাতে শত্রুর দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। সে ঘন ঘন এদিক-সেদিক গুলি করছিল পরিখার বাইরে বের হয়ে আর বারবার হাজি মুরাদের দিকে তাকাচ্ছিল। নোংরা খানেফি এখানেও ভৃত্যের কাজই করছিল। হাজি মুরাদ আর খান মাহোমা তার হাতে বন্দুক দিলে সে সাবধানে শিক দিয়ে বারুদ গেদে তাতে তেলে ভেজানো ন্যাকড়ায় মোড়া গুলি ভরে দিচ্ছিল। বাটা অন্যদের মতো পরিখায় থাকেনি। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে দৌড়ে ঘোড়াগুলোর কাছে যায়। আর চিৎকার করে দৌড়াতে দৌড়াতে বন্দুক কোনো কিছুর সঙ্গে না ঠেকিয়েই সে গুলি করছিল। সে-ই আহত হলো সবার আগে। তার ঘাড়ে গুলি ঢুকেছিল। সে বসে পড়ল। রক্তমাখা থুতু ছিটিয়ে সে শাপশাপান্ত করতে থাকল। তারপর আহত হলো হাজি মুরাদ। একটা গুলি তার কাঁধে ঢুকেছিল। বেশমেতের ভেতরের দিক থেকে কিছু তুলো ছিঁড়ে ক্ষতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তিনি আবার গুলি চালাতে থাকলেন।

'চলুন, আমরা তলোয়ার দিয়ে ওদের চামড়া তুলে ফেলি!' তৃতীয়বারের মতো বলল এলডার। মাটির বাঁধটার পেছন থেকে শত্রুর দিকে ছুটে যেতে সে প্রস্তুত। সেই মুহূর্তে একটা গুলি এসে লাগল তার গায়ে। সে ধনুকের মতো বেঁকে পেছনে হাজি মুরাদের পায়ের ওপর পড়ে গেল। হাজি মুরাদ দেখলেন, তার ভেড়ার মতো চোখ উৎসুক দৃষ্টিতে খোলা। তার মুখে ওপরের ঠোঁটটা শিশুর ঠোঁটের মতো খোলা। মুখ থেকে বুদ্‌বুদ বের হচ্ছে। হাজি মুরাদ তার নিচ থেকে নিজের পা বের করে নিয়ে আবার গুলি চালাতে শুরু করলেন।

খানেফি এলডারের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার চাপকানের ভেতর থেকে ব্যবহার না করা গুলিগুলো বের করে নিতে শুরু করল।

খান মাহোমা তার জিকির চালিয়ে যাচ্ছিল, ফাঁকে ফাঁকে গুলিও করছিল। শত্রুরা চিৎকার করতে করতে সাবধানে এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে দৌড়ে যাচ্ছিল এবং একটু একটু করে কাছে চলে আসছিল।

হাজি মুরাদের বাঁ দিকে আরেকটি গুলি লাগল। তিনি আবার শুয়ে পড়ে বেশমেত থেকে তুলো বের করে গুঁজে দিলেন। কিন্তু আঘাতটা ছিল মারাত্মক। তার মনে হলো তিনি মারা যাচ্ছেন। তার কল্পনায় একের পর এক ছবি ও স্মৃতি ভেসে উঠতে শুরু করল। দেখলেন আবু নুতসাল খান এক

BanglaBook.org

হাতে ছোরা আর অন্য হাতে কাটা গাল চেপে ধরে শত্রুর দিকে তেড়ে যাচ্ছে, তারপর দেখলেন দুর্বল রক্তশূন্য ভরন্তসভের মুখ। কানে বাজল তার ধূর্ত মুখে নরম গলার কথা। তারপর তিনি দেখলেন তার ছেলে ইউসুফ ও স্ত্রী সোফিয়ার মুখ। তারপর তার চোখে ভেসে উঠল ফ্যাকাশে ও লাল দাড়িওয়ালা শত্রু শামিলের মুখ, আধবোজা চোখ। এই সব ছবি ভেসে ওঠার সময় তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না—না দয়া, না রাগ বা অন্য কোনো রকম ইচ্ছা জাগল না। তার মধ্যে যা শুরু হতে যাচ্ছিল বা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার তুলনায় অন্য সবকিছু তুচ্ছ।

তা সত্ত্বেও সবল দেহে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন, তা-ই চালিয়ে গেলেন। সব শক্তি সঞ্চয় করে তিনি বাঁধের পেছন থেকে উঠে তার দিকে দৌড়ে আসা একটা লোককে লক্ষ্য করে গুলি করলেন। লোকটা পড়ে গেল। তারপর হাজি মুরাদ পরিখা থেকে বের হয়ে এলেন। ভীষণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোরা হাতে এগিয়ে গেলেন সোজা শত্রুর দিকে।

কয়েকটি গুলি ফুটল। তিনি বাঁকা হয়ে পড়ে গেলেন। কয়েকজন সৈন্য বিজয় উল্লাসে তার পড়ে যাওয়া দেহটার দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু মৃত মনে হওয়া শরীরটা হঠাৎ নড়ে উঠল। প্রথমে খালি ন্যাড়া মাথাটা উঠল, পরে একটা গাছের গুঁড়ি হাত দিয়ে ধরে উঠল শরীরটা। তাকে এত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল যে যারা তার দিকে দৌড়ে আসছিল, তারা থমকে দাঁড়াল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার শরীরটা গাছ থেকে ছিটকে উপুড় হয়ে পড়ল। কাঁটা গেন্ধালির মতো শরীরটা পড়ল পুরো লম্বা হয়ে। তিনি আর নড়লেন না।

তিনি নড়তে পারছিলেন না, কিন্তু অনুভব করতে পারছিলেন। তার কাছে সবচেয়ে আগে এসেছিল হাজি আগা। সে একটা বড় ছোরা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। হাজি মুরাদের মনে হলো, কেউ হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন না, কে বা কেন তা করছে। এটাই ছিল শরীর নিয়ে তার শেষ চেতনা। তার আর কোনো হুঁশ ছিল না। শত্রুরা তার শরীরে লাথি মারতে আর কোপাতে শুরু করল, যেটার মধ্যে তাদের মতো প্রাণ ছিল না।

হাজি আগা লাশটার পিঠে পা দিয়ে দাঁড়াল এবং দুই কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলল এবং পা দিয়ে ওটা সরিয়ে দিল সাবধানে, যাতে জুতায় রক্ত লেগে না যায়। ঘাড়ের ধমনিগুলো থেকে ফিনকি দিয়ে তাজা লাল রক্ত বের হয়ে এল, আর মাথা থেকে কালো রক্তে ঘাসগুলো ভিজতে থাকল।

কারগানভ, হাজি আগা, আহমেদ খান ও সৈন্যরা হাজি মুরাদের লাশ এবং তার সঙ্গীদের চারপাশে (খানেফি, খান মাহোমা আর গামজালোকে

BanglaBook.org

বেঁধে ফেলা হয়েছিল) শিকারির মতো ঘিরে দাঁড়াল। ঝোপগুলোর ওপরে বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে তারা বিজয় উল্লাস করছিল।

গোলাগুলির সময় বুলবুলিগুলো গান থামিয়ে দিয়েছিল। আবার সেগুলো তীক্ষ্ণ সুরে গাইতে শুরু করল। প্রথমটা একদম কাছ থেকে, তারপরে দূরেরগুলো।

চষা খেতের মধ্যে দলে যাওয়া কাঁটা গেন্ধালির ডালটা দেখে যে মৃত্যুর ঘটনা আমার মনে পড়েছিল, এটাই সে ঘটনা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org